ভারত-চিত্র গ্রন্থাবলী—সংখ্যা ১

আর্য্য-নারী

প্রথম ভাগ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম, এ,

ও

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার

প্রণীত।

—*—

পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

কলিকাতা,

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট,

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌স্ হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

আর্য্য-নারী ১ম ভাগ

পরিবর্দ্ধিত

দ্বিতীয় সংস্করণ।

বাঁধাই ১।০ সিকা।

"আর্য্য-নারী"

সম্বন্ধে

কয়েকটি অভিমত।

স্যর শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কে, টি,—"'আর্য্যনারী' আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই সম্যক্ আদরের বস্তু।"

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার,—"'আর্য্যনারী' বড় সুন্দর।"

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর,—"অতি মহৎ কার্য্য সুন্দর সফল হইয়াছে।"

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল,—"গ্রন্থ সুপাঠ্য, লোকহিতকর।"

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম, এ, বি, এল,—পুস্তক বাঙ্গালায় অমর হইবে। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পঠিত হইবে।"

কবি শ্রীযুক্তা মানকুমারী দাসী,—"আর্য্যনারী, জাতীয় সাহিত্যে উজ্জ্বল রত্ন।"

ভারতী,—"জাতীয় অমূল্য গ্রন্থাবলী,— জাতীয় উন্নতির সহায়; —সুললিত,—হৃদয়গ্রাহী।"

প্রবাসী,—"'আর্য্যনারী' কন্যা ভগিনীদিগকে উপহার দিবার উপযুক্ত অতি উপাদেয় শ্রীপাঠ্য পুস্তক।"

বসুমতী,— "প্রত্যেক গৃহলক্ষ্মীরই এই পুস্তক খানি পাঠ করা উচিত। ইহার ভাষাও অতি প্রাঞ্জল।"

ঢাকাপ্রকাশ,—"এই পুস্তকের সকলই সুন্দর। ললনাগণ এরূপ গ্রন্থে মনোনিবেশ করিলে সংসার আবার সুখের আগারে পরিণত হইবে।"

শিক্ষা-সমাচার;—"দেশের মহান্ অভাব দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে। এ গ্রন্থ সর্ব্বাংশেই অতুলনীয়।"

বৃহদক্ষরে পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ।

আকার প্রায় দেড়গুণ বাড়িয়াছে,

অথচ মূল্য, সাধারণ———পূর্ব্ববৎ একটাকা।

বাঁধাই—১।০ সিকা মাত্র।

ভারত-চিত্র গ্রন্থাবলী—সংখ্যা ১

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্ স্

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

১৩১৬

প্রথম ভাগ

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম, এ

ও

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

প্রণীত।

—*—

প্রথম সংস্করণ—কার্ত্তিক ১৩১[illegible]

দ্বিতীয় সংস্করণ—চৈত্র ১৩১[illegible]

কলিকাতা,

৬ নং বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট,

কমলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ হালদার কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন

এবং

শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জনের

নূতন গ্রন্থ—

সচিত্র

সরল চণ্ডী।

(হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রীশ্রীচণ্ডীর সমগ্র আখ্যান।)

বালকবালিকার, বধূর, বঙ্গগৃহিণীগণের

এবং

সর্ব্বসাধারণের সুপাঠ্য—

সরল সুললিত—সুন্দর।

ছবিগুলি অতি চমৎকার।

গ্রন্থ বৃহদক্ষরে রঙিন্ উৎকৃষ্ট ছাপা।

অতি সুন্দর বাঁধাই।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌স্।

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
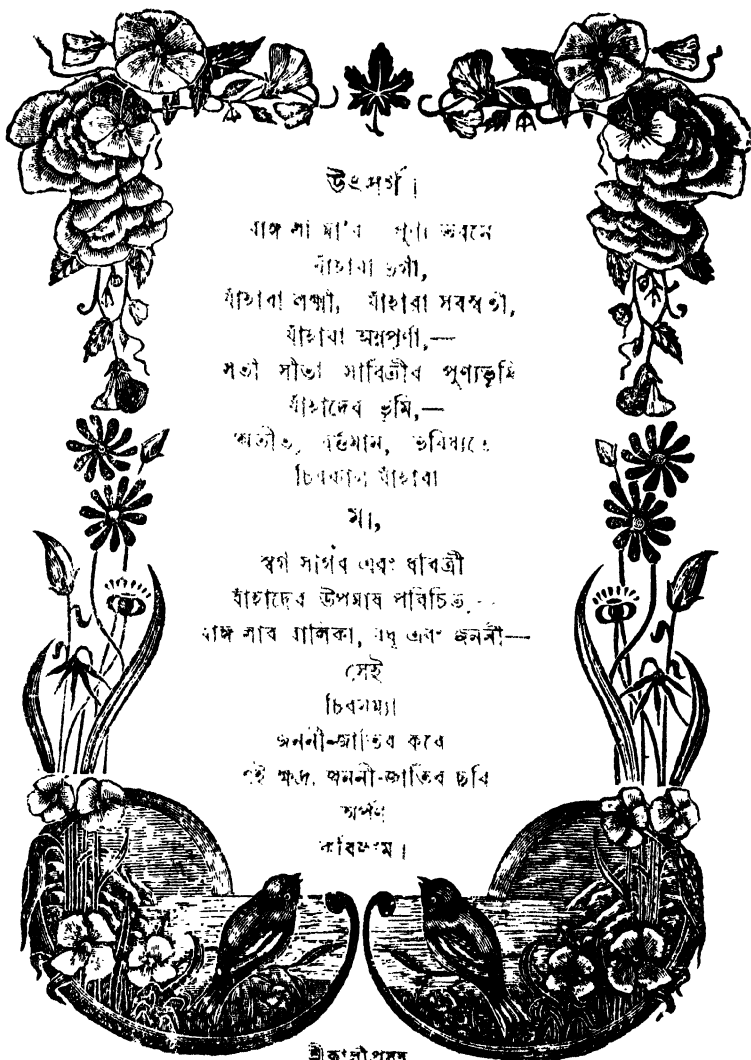
আর্য্য-নারী।

প্রথমভাগ।

উৎসর্গ।

বাঙ্গলা মা'র পুণ্য ভবনে
যাঁহারা দুর্গা,
যাঁহারা লক্ষ্মী, যাঁহারা সরস্বতী,
যাঁহারা অন্নপূর্ণা,—
সতী সীতা সাবিত্রীর পুণ্যভূমি
যাঁহাদের ভূমি,—
অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যতে
চিরকাল যাঁহারা
মা,
স্বর্গ সাগর এবং ধরিত্রী
যাঁহাদের উপমায় পরিচিত,—
বাঙ্গলার বালিকা, বধূ এবং জননী—
সেই
চিরন্ময়ী
জননী-জাতির করে
এই ক্ষুদ্র জননী-জাতির ছবি
অর্পণ
করিলাম।

শ্রীকালীপ্রসন্ন
শ্রীনলিনীরঞ্জন

— ❋ ❋ ❋ —

"কন্যাপেবং পালনীয়া,
শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।"

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে
রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

— ❋ ❋ ❋ —

আর্য্য-নারী।

প্রথম ভাগ।

সতী।

(১)

জগতের নারীবৃন্দকে সতীর ধর্ম্ম শিখাইবার জন্যই যেন, স্বয়ং আদ্যাশক্তি ভগবতী সতীরূপে দক্ষ-প্রজাপতির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

যে সকল আদি রাজর্ষি ও মহর্ষিগণ হইতে জগতের 'প্রজা' অর্থাৎ প্রাণীসমূহ উৎপন্ন হইয়া, যাঁহাদের প্রবর্ত্তিত নিয়মে জগতে বাস করিতেছে, প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহারাই প্রজাপতি নামে বিখ্যাত। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা প্রজা-সৃষ্টি-মানসে, প্রথমে মারীচ, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ প্রভৃতি আদি ঋষিগণের এবং দক্ষ, নারদ ও ধর্ম্মদেব প্রভৃতির সৃষ্টি করেন। দক্ষ-প্রজাপতি হইতে বহু

কন্যার উৎপত্তি হয়। সাতা'শ জন সাতা'শ নক্ষত্ররূপে চন্দ্রের স্ত্রী হইয়া আকাশে আছেন। ধর্ম্মের স্ত্রী-রূপিণী আর দশজন হইতে দেব ও মানবের বিবিধ গুণের অধিষ্ঠাতা স্বরূপ দিব্যপুরুষ-গণ উৎপন্ন হইয়াছেন। অদিতি, দিতি, দনু প্রভৃতি ত্রয়োদশ কন্যাকে মরীচপুত্র কশ্যপ বিবাহ করেন। ইঁহাদিগ হইতেই দেব, দানব, দৈত্য, মানব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অপ্সরা, পশু পক্ষী প্রভৃতি বিশ্ববাসী প্রায় সমুদয় স্বর্গীয় ও পার্থিব প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে।

সতী এই দক্ষ-প্রজাপতির কনিষ্ঠা কন্যা। দক্ষ এই কন্যা মহাদেবকে সম্প্রদান করেন। মহাদেব অসীম শক্তি-শালী মহাযোগী মহাপুরুষ। সংসারে ও সন্ন্যাসে, ভোগে ও বৈরাগ্যে, স্বর্গে ও শ্মশানে, দেবে ও পিশাচে, মানবে ও পশুতে, রত্নভূষণে ও মৃতকঙ্কালে, চন্দনে ও চিতাভস্মে তাঁহার সমজ্ঞান। সর্ব্বভূতে এই সমজ্ঞান দেখাইবার জন্য তিনি শ্মশানবাসী। বাঘছাল তাঁহার বসন, কঙ্কালমালা ও ভুজঙ্গ তাঁহার ভূষণ, বৃষ তাঁহার বাহন, চিতাভস্ম তাঁহার বিরাট জ্যোতির্ম্ময় দেহের অনুলেপন, ভূত-প্রেত-পিশাচগণ তাঁহার সহচর।

স্বামীর এই বীভৎস বেশ-ভূষা ও আচরণে রাজর্ষিদুহিতা সতীর হৃদয়ে বিন্দুমাত্র ভয় বা ঘৃণার উদয় হইল না। মহাপ্রাণ স্বামীর মহাপ্রাণতায় তিনি মুগ্ধ হইলেন। ভক্তিভরে কায়মনে তিনি সম্পূর্ণরূপে পতির ধর্ম্ম অবলম্বনে সহধর্ম্মিণী নাম সার্থক করিলেন। স্বামীর সঙ্গে তিনিও শ্মশানবাসিনী যোগিনী হইলেন, সোণার

অঙ্গে চিতাভস্ম মাখিলেন, স্বামী-সহচর ভূত-প্রেত-পিশাচগণকে জননীর ন্যায় স্নেহদানে তৃপ্ত ও তুষ্ট করিলেন।

(২)

আদি ঋষিগণের মধ্যে ভৃগু নামে একজন ঋষি ছিলেন। কোন সময়ে তিনি এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দেবগণ, ঋষিগণ, প্রজাপতিগণ সকলে সেই যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। দক্ষরাজ যখন সেই যজ্ঞসভায় উপস্থিত হন, তখন সভাস্থ সকলে উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু আপনার মহাভাবে বিভোর যোগীশ্বর,—সমস্ত লোকাচারের অতীত ভোলানাথ মহাদেব উঠিয়া তাঁহার প্রতি কোন সম্মান দেখাইলেন না।

দক্ষ ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সভার মধ্যে মহাদেবকে অতি তীব্র ভাষায় তিরস্কার করেন।

সম্মানে ও অবমাননায়, মিষ্ট সম্ভাষণে ও তিরস্কারে, ভক্তিতে ও অভক্তিতে, শুভ ও অশুভ ঘটনায় কোনরূপ চিত্তবিকারের অতীত ভোলানাথ নীরবে রহিলেন। দক্ষের আচরণে তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই। কিন্তু মহাদেবের অনুচরবর্গের সঙ্গে দক্ষ ও সভাস্থ অন্য কাহারও কাহারও এই প্রসঙ্গে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইল। এই বিবাদ ক্রমে উপস্থিত ব্যক্তিগণের বিনাশের কারণ হইতে পারে, তাই মহাদেব অনুচরবর্গ সহ সভা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু দক্ষের মন মহাদেবের প্রতি দারুণ ক্রোধ ও বিদ্বেষে পূর্ণ হইয়া রহিল।

কিছুকাল পরে দক্ষ নিজে এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। ত্রিভুবনবাসী সকলকেই দক্ষ নিমন্ত্রণ করিলেন; কেবল মহাদেব ও সতীকে তিনি নিমন্ত্রণ করিলেন না।

ভ্রাতা নারদের উপরে দক্ষ নিমন্ত্রণের ভার দেন। দেব-ঋষিগণের পূজিত শ্রেষ্ঠ পুরুষ মহাদেবের এই অবমাননায় নারদ যার-পর-নাই দুঃখিত ও বিরক্ত হইলেন। মোহান্ধ দক্ষের এই শিব-বিরহিত অপূর্ণ যজ্ঞে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হয়, এইরূপ তাঁহার ইচ্ছা হইল। তিনি সতীকে এই যজ্ঞের সংবাদ দিয়া আসিলেন।

অনিমন্ত্রিত হইয়াও সতীর পিতৃগৃহে পিতৃযজ্ঞে যাইবার জন্য অদমনীয় বাসনা হইল। তিনি স্বামীর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। এ অবস্থায় পিতৃগৃহে গেলে, সতীকে যার-পর-নাই লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইতে হইবে, দক্ষের মুখে শিবের নিন্দা শুনিয়া তাঁহাকে নিতান্ত ব্যথিত হইতে হইবে, এই বলিয়া মহাদেব সতীকে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু সতী বুঝিলেন না।

অগত্যা মহাদেব তাঁহাকে অনুমতি দিলেন।

বৃষবাহনে চড়িয়া, ভূত-প্রেত পিশাচ প্রভৃতি অনুচরগণের সঙ্গে, সতী পিতৃগৃহে যাত্রা করিলেন।

(৩)

দক্ষের যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। ত্রিভুবনের দেবগণ ও ঋষিগণ, সতীর মাতা ও ভগিনীগণ, সকল যজ্ঞসভায় আসীন রহিয়াছেন,—এমন সময় সতী সেখানে উপস্থিত হইলেন।

সতীর মাতা ও ভগিনিগণ তাঁহাকে আদরে অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু দক্ষ এবং দক্ষের ভয়ে উপস্থিত অন্যান্য সকলে তাঁহাকে কোনরূপ আদর ও সম্মান দেখাইলেন না। সতীকে দেখিয়া শিবের প্রতি দক্ষের ক্রোধ ও বিদ্বেষ ঘৃতস্পর্শে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। রোষ ও ঘৃণাপূর্ণ অতি কঠোর বাক্যে দক্ষ মহাদেবের দারুণ নিন্দাবাদে সতীর লাঞ্ছনার একশেষ করিলেন।

মহাপুরুষ স্বামীর এই অবমাননা সতীর সহ্য হইল না। পিতাকে সম্বোধন করিয়া তিনি কহিলেন,—"পিতা, ত্রিভুবনে যাঁ'র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, ত্রিভুবনে কাহারও সঙ্গে যাঁ'র বিরোধ নাই, প্রেম ও বিদ্বেষ, মিত্রতা ও শত্রুতা, আপন ও পর-ভাবের অতীত মহাযোগী মহাপুরুষ যিনি, তাঁ'র প্রতি তোমার এ বিদ্বেষ কেন? যাঁ'র শিব-নামে জীবের অজ্ঞানতা দূর হয়, দেবগণ নিত্য যাঁ'র প্রসাদের অভিলাষী, শ্মশানবাসী—পিশাচসঙ্গী—চিতাভস্ম ও কঙ্কালমালায় ভূষিত হইলেও যাঁ'র চরণের নির্ম্মাল্য দেবগণ মস্তকে ধারণ করেন, আজ তুমি তাঁহাকে এইরূপ ঘৃণিত বাক্যে নিন্দা করিতেছ? আপনার আত্মার মহিমায়, আত্মার আনন্দে যিনি বিভোর, যিনি বেদবিধির—শাস্ত্রবিধির অতীত, কর্ম্মবন্ধন যাঁহাকে কখনও আবদ্ধ করিতে পারে নাই, পারিবে না,— দেহধারী হইয়াও যিনি মুক্ত,—ভোগ ও যোগ, গৃহ ও শ্মশান দুই-ই যাঁহার কাছে সমান,—হর্ষ-বিষাদ, শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধা, অনুরাগ-বিরাগ, কিছুতেই যাঁহার চিত্তবিকার হয় না, তুমি কে পিতা, যে, সেই মহাপ্রাণ মহাপুরুষের অবমাননা করিতেছ? যে যজ্ঞের প্রধান পূজ্য যজ্ঞেশ্বর

তিনি, সেই যজ্ঞানুষ্ঠান তোমার ধর্ম্ম ; যে ধনরত্ন তিনি ধূলির মত পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই ধনরত্নেই তোমার ঐশ্বর্য্য-গৌরব ; যে দেবগণ অবিরত তাঁ'র পূজা করিতেছেন, সেই দেবগণকে পূজা করিয়া তুমি কৃতার্থ হইতেছ ! যে কর্ম্ম তোমার জীবনের আশ্রয়, মুক্তপুরুষ তিনি সেই কর্ম্মের অতীত ;— কর্ম্মই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে।—ধিক্,—সেই মহাপুরুষের সহধর্ম্মিণী আমি, সেই মহাপুরুষ-বিদ্বেষী তোমার মত পিতার সন্তান বলিয়া জীবনে আমার ধিক্কার হইতেছে !—তোমা হইতে উৎপন্ন এই পাপ-দেহ-ধারণে আমার ঘৃণা হইতেছে ! আমার প্রাণ, আমার আত্মা তাঁহারই চরণে আশ্রিত,—চিরদিন তাহারই চরণে আশ্রিত থাকিবে। কিন্তু, তোমা হইতে প্রাপ্ত দেহস্পর্শে তাঁহার সেই পবিত্র দেববাঞ্ছিত চরণ আর কলঙ্কিত করিব না। স্বামীবিদ্বেষী স্বামীর নিন্দুক পিতার দত্ত দেহ লইয়া স্বামীর গৃহে আর প্রবেশ করিব না। যে দেহ তুমি দিয়াছ, তোমার গৃহে সেই দেহ ত্যাগ করিয়া দেহমুক্ত প্রাণে আমার একমাত্র দেবতা—একমাত্র গতি সেই ভগবানের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিব।"

এ বলিয়া সতী যোগাসনে বসিয়া দেহত্যাগ করিলেন।

(৪)

দ্রতেজে অনুপ্রাণিত রুদ্রের অনুচরগণ দক্ষযজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করিয়া দক্ষের প্রাণবিনাশ করিল। দক্ষপত্নী প্রসূতির প্রার্থনায় মহাদেব ছিন্নমুণ্ড দক্ষের দেহে ছাগমুণ্ড সংলগ্ন করিয়া তাঁহার প্রাণদান করিলেন।

কথিত আছে,—সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া মহাদেব ত্রিভুবন মথিত করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সৃষ্টিরক্ষার জন্য বিষ্ণু সুদর্শনচক্রে শিবের স্কন্ধে বাহিত সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া নানা স্থানে নিক্ষেপ করেন। সেই সব স্থান পীঠস্থান বলিয়া ক্রমে মহাতীর্থে পরিণত হইল। সতীর দেহ হইতে এইরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া মহাদেব মহাযোগে নিমগ্ন হ'ন।

দেহত্যাগের পর সতী হিমালয়রাজের কন্যা উমারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, বহুকাল যোগনিমগ্ন মহাদেবের তপস্যাচরণে, আবার তাঁহাকেই পতিরূপে লাভ করিলেন।

সীতা।

(১)

এ দেশে কন্যার নাম কেহ সীতা রাখিতে চায় না। লোকের ধারণা, সীতা নাম রাখিলে কন্যা দুর্ভাগ্যবতী হইবে! জনকের মত পিতা, দশরথের মত শ্বশুর, কৌশল্যার মত শাশুড়ী, রামের মত স্বামী, লক্ষ্মণের মত দেবর, অযোধ্যার মত রাজসংসার, —নারীজন্মে যাহা কিছু কাম্য হইতে পারে, সীতা সবই পাইয়াছিলেন, কিন্তু জীবন ভরিয়া দুঃখে তাঁহার কাল কাটিয়াছে, দুঃখেই কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাই সকলে সীতাকে অতি দুর্ভাগ্যবতী মনে করিয়া থাকেন।

কিন্তু সীতা কি সত্য সত্যই দুর্ভাগ্যবতী? অসাধারণ পতিভক্তি, সুশীলতা, শান্তস্বভাব, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণে যে রমণী আজ ভারতে,—ভারতে কেন, সমগ্র জগতে আদর্শ-রমণী বলিয়া পূজিতা, সেই রমণী কি দুর্ভাগ্যবতী? মহৎ চরিত্রের মহত্ত্ব দুঃখেই প্রকাশ পায়। সীতা যদি নিষ্কণ্টকে স্বামীসহ রাজ্যভোগ করিয়াই জীবন কাটাইতেন, তবে কে আজ সীতার নাম জানিত? কে আজ সীতার নামে জয়কার উঠাইত? কে আজ সীতাকে দেবী বলিয়া পূজা করিত? দুঃখ পাইয়াছিলেন,—দুঃখে দেব-দুর্ল্লভ ধীরতা, সহিষ্ণুতা ও মহত্ত্ব দেখাইয়াছিলেন—তাই সীতা আজ সীতা। স্বামী-সঙ্গে বনবাসের কষ্টে—বন-ভ্রমণের ক্লান্তিতেও তাঁহার মুখে প্রফুল্ল হাসি দেখা যাইত;

রাবণবধে বিপন্মুক্ত হইয়া অশোকবনে চেড়ীগণের শত উৎপীড়ন বিস্মৃত হইয়াও স্নেহভরে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছিলেন; বিনা-দোষে নির্ব্বাসিত হইয়াও একবারের তরেও রামের উপর রোষপ্রকাশ না করিয়া বরং তাঁহার দুঃখে দুঃখপ্রকাশ করিয়া-ছিলেন,—তাই সীতা আজ সীতা। এমন সীতা যদি দুর্ভাগ্যবতী, তবে সৌভাগ্যবতী জগতে কে? এতটুকুও মহত্ত্বের গৌরব বুঝিতে পারেন, এমন পিতা মাতা কে আছেন, যে, সীতার মত কন্যা-লাভের কামনা করিবেন না? সীতার মত কন্যা যে পিতামাতার, সন্তানভাগ্যে সেই পিতামাতাই ভাগ্যবান্। সীতার মত কন্যা যে বংশে জন্মে, বহুপুণ্যফলে সেই বংশ ধন্য হয়। সীতার মত বধূ যে কুলে যায়, বধূ-গৌরবে সে কুল গৌরবান্বিত হয়।

বিহার প্রদেশের উত্তরভাগে ত্রিহুত নামে এখন যে জনপদ আছে, পূর্ব্বে ঐ স্থানেই মিথিলা বা বিদেহ দেশ ছিল। মিথিলা-দেশে চন্দ্রবংশ-সম্ভূত জনক নামে প্রসিদ্ধ এক রাজা ছিলেন। রাজা হইয়াও ধর্ম্মজ্ঞানে ও চরিত্রে তিনি ঋষিতুল্য ছিলেন; তাই লোকে জনককে 'রাজর্ষি' বলিত। জনকরাজার সভায় মুনিঋষিগণ সমবেত হইয়া ধর্ম্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা করিতেন। এই সব আলোচনা হইতেই প্রসিদ্ধ উপনিষদ-গ্রন্থ-গুলি উৎপন্ন হইয়াছে।

রাজা জনক একদিন যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন। সহসা লাঙ্গল-পদ্ধতি হইতে অতি সুন্দর একটি কন্যা বাহির হইল।

লাঙ্গল-পদ্ধতিকে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় 'সীতা' বলিত। 'সীতা' হইতে কন্যা উঠিল বলিয়া সীতা নাম রাখিয়া, জনক নিজকন্যার ন্যায় সীতাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। জনকের স্ত্রীর গর্ব্ভেও ঊর্ম্মিলা নামে একটি কন্যা হয়; কিন্তু ঊর্ম্মিলা অপেক্ষাও জনক সীতাকে অধিক স্নেহ করিতেন। জনক রাজার কন্যা বলিয়া সীতা 'জানকী' নামেও বিখ্যাত হন। মিথিলা বা বিদেহ দেশের রাজকন্যা বলিয়া সীতার অন্য নাম মৈথিলী ও বৈদেহী।

দেবরাত নামে জনকের এক পূর্ব্বপুরুষ মিথিলার রাজা ছিলেন। দক্ষযজ্ঞে মহাদেবকে অপমান করিবার জন্য দক্ষ মহাদেবকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। দেবগণ ইহার কোন প্রতিকার না করায়, মহাদেব এক বিশাল ধনু গ্রহণ করিয়া দেবগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। পরে দেবগণের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া সেই ধনুক মহাদেব দেবগণকে প্রদান করেন। দেবগণ সেই ধনুক জনকের পূর্ব্বপুরুষ মিথিলারাজ দেবরাতের নিকট রাখেন। সেই অবধি সে ধনুক সেখানেই ছিল।

পরম রূপলাবণ্যবতী সীতাকে যোগ্য বীরের হস্তে সম্প্রদান করিবেন, এই মনে করিয়া, জনক এই পণ করিলেন যে, যে বীর সেই বিশাল হর-ধনুতে জ্যা রোপণ করিতে অর্থাৎ গুণ পরাইতে পারিবেন, তাঁহার সঙ্গে সীতার বিবাহ দিবেন। সীতার বিবাহ-যোগ্য বয়স হইলে, অনেক বীর-রাজা সীতালাভের জন্য মিথিলায় আসিলেন, কিন্তু কেহই সে ধনুকে জ্যা রোপণ করিতে পারিলেন না। পরে, অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্র অনায়াসে

সেই ধনুকে জ্যা-রোপণ করিয়া ধনুক ভাঙ্গিয়া দুইখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। রামচন্দ্রের সঙ্গে সীতার বিবাহ হইল। সেই সময় লক্ষ্মণ ঊর্ম্মিলাকে বিবাহ করিলেন। অপর দুই ভ্রাতা ভরত ও শত্রুঘ্নের সঙ্গে জনকের ভ্রাতা কুশধ্বজের দুই কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির বিবাহ হইল।

(২)

সীতা ও তাঁহার ভগিনীরা বিবাহের পর অযোধ্যায় আসিলেন। কিছুকাল পরমসুখে তাঁহাদের জীবন কাটিল।

এখন, রাজা দশরথ বৃদ্ধ হইয়াছেন; জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। অভিষেকের দিন স্থির হইল। নগর ভরিয়া আনন্দোৎসব আরম্ভ হইল। কিন্তু ঐ আনন্দোৎসব অচিরে করুণ বিষাদময় শোকের উচ্ছ্বাসে পরিণত হইল।

পূর্ব্বে কোন অসুর-যুদ্ধে দশরথ গুরুতররূপে আহত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, মধ্যমা মহিষী কৈকেয়ীর শুশ্রূষাগুণে তিনি আরোগ্যলাভ করিয়া তাঁহাকে দুইটি বর দিতে চাহিয়াছিলেন। কৈকেয়ী তখন সেই বর না লইয়া, প্রয়োজনমত লইবেন বলিয়াছিলেন। পিতৃগৃহ হইতে কৈকেয়ীর সঙ্গে মন্থরা নামে অতি ক্রূর-চরিত্রা কুব্জা এক দাসী আসিয়াছিল। অভিষেকের পূর্ব্বদিন রাত্রিতে, মন্থরার পরামর্শে কৈকেয়ী রাজা দশরথের নিকট ভরতের রাজ্যাভিষেক এবং রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস এই দুই

বর প্রার্থনা করিলেন। প্রাণ গেলেও তখন রাজারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতেন না। কৈকেয়ীকে বর দিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, কাজেই কৈকেয়ীর প্রার্থনা পূরণে তিনি অস্বীকার করিতে পারিলেন না। এদিকে প্রাণাধিক পুত্র রামকেই বা কি করিয়া রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া বনে পাঠাইবেন? দশরথ কৈকেয়ীকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক মিনতি করিলেন, অনেক ভৎর্সনা করিলেন। কিন্তু কৈকেয়ীর মন কিছুতেই টলিল না। দারুণ শোকে আকুল হইয়া রাজা দশরথ তখন অবসন্ন হৃদয়ে, অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া রহিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে রাম সকল ঘটনা শুনিয়া পিতার সত্য-পালনের জন্য রাজ্য লাভের বাসনা ত্যাগ করিয়া বনগমনে প্রস্তুত হইলেন। মাতা কৌশল্যাকে শান্ত করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া রাম সীতার নিকটে আসিলেন। রামের বনবাসকালে সীতাকে গৃহে কিরূপভাবে চলিতে হইবে ইত্যাদি উপদেশ দিয়া রাম বিদায় চাহিলেন।

সীতা কহিলেন,— "আর্য্যপুত্র, তুমি এ কি বলিতেছ? তোমার কথা শুনিয়া আমার হাসি পাইতেছে। তুমি কি আমাকে এত হীন মনে কর যে, তুমি বনে যাইবে আর আমি গৃহে থাকিব? স্বামীই স্ত্রীলোকের দেবতা, স্বামীই ধর্ম্ম, স্বামীই সুখ। স্ত্রীলোকের জীবন স্বামীময়, স্বামী ছাড়া স্ত্রীর পৃথক্ অস্তিত্ব কিছুই থাকিতে পারে না। স্বামীর ভাগ্যেই স্ত্রীলোকের ভাগ্য, স্বামীর সুখে তা'র সুখ, দুঃখে তা'র দুঃখ, সম্পদে তা'র সম্পদ, বিপদে

বিপদ। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, গৃহে অরণ্যে, স্বামীর পদতলই তা'র একমাত্র আশ্রয়। তুমি যতদিন রাজপুত্র, আমি ততদিন রাজবধূ, তুমি যখন রাজা, আমি তখন রাণী, তুমি যখন বনবাসী, আমি তখন বনবাসিনী। তোমার সঙ্গে আজ আমারও বন-গমনের আদেশ হইয়াছে জানিতে হইবে। তুমি যদি বনে যাও, আমি কুশ-কণ্টক পায়ে দলিয়া তোমার আগে আগে যাইব।"

রাজগৃহের নানা-বিলাস-পরিপূর্ণ সুখে প্রতিপালিতা সরলা সীতা বনবাসের ক্লেশ কখনও মনেও আনিতে পারেন না। তাই রাম, বনবাসের নানাবিধ ক্লেশ বর্ণনা করিয়া সীতাকে কহিলেন,—"কোমলপ্রাণা বালিকা তুমি, তুমি কি এই সব দুঃখ কষ্ট সহিতে পারিবে? আমার কথা শোন, গৃহে থাক, বনবাসের ক্লেশ তুমি কখনও সহিতে পারিবে না।"

সীতা কহিলেন,—"ছি ছি, ক্লেশের ভয় তুমি আমাকে কি দেখাইতেছ? তোমার সঙ্গই আমার একমাত্র সুখ, বিরহই আমার একমাত্র ক্লেশ। তোমার সঙ্গে অরণ্যে বাসও আমার স্বর্গবাস। তোমার বিহনে এই রাজগৃহ আমার শ্মশান। তোমার সঙ্গে বনভ্রমণে বনের কণ্টকিত পথ ফুলের পথের মত আমার সুখের হইবে। তোমার সঙ্গে পর্ণকুটীরে বাস, তৃণশয্যায় শয়ন, ফলমূল ভক্ষণ, তোমাবিরহিত এই রাজগৃহের সহস্র বিলাস অপেক্ষা আমার অনেক বেসি ভাল লাগিবে। প্রখর রৌদ্রে শরীর দগ্ধ হইলে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া আমি শীতল

হইব। পথের ধূলিতে আমার শরীর ভরিলে আমি ফুলের রেণুর মত তাহা মনে করিব। অল্প হউক বেসি হউক, গাছের পাতা ফল মূল তুমি যাহা দিবে, তাহাতেই অমৃতের মত আমি তৃপ্তি পাইব। তোমার সঙ্গে বনবাসের স্থুখে এই রাজগৃহের বিলাসের কথা, রাজগৃহের সঙ্গিনীদের কথা, স্বজনগণের স্নেহের কথা কিছুই আমার মনে হইবে না। তুমি ভাবিও না। আমার জন্য তোমায় ক্লেশ পাইতে হইবে না। আমি ক্লান্ত হইয়াও হাসিমুখে তোমার সঙ্গে পথ চলিব। আহারের জন্য, বসনের জন্য, কোন অভাব পূরণের জন্য তোমাকে বিরক্ত করিব না। কোন কষ্টই কষ্ট বলিয়া তোমাকে জানিতে দিব না। তোমার কোন ভার বোঝা আমি হইব না। আমাকে সঙ্গে লইয়া যাও, ফেলিয়া যাইও না। তোমাকে ছাড়িয়া একদিনও আমি বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না।”

রাম তখন বনে নানাবিধ হিংস্রজন্তু ও রাক্ষস প্রভৃতির ভয়ের কথা, পদে পদে বিপদের কথা বলিয়া সীতাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন।

সীতা কহিলেন,—“আমার পিতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর জানিয়া তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়াছিলেন। আজ স্ত্রীলোকের মত কেন ভয়ের কথা তুমি বলিতেছ? পুরুষ হইয়া, বীর হইয়া নিজের স্ত্রীকে তুমি রক্ষা করিতে পারিবে না? বিপদের ভয়ে চিরসঙ্গিনী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে? পুরুষশ্রেষ্ঠ হইয়া পরের হাতে স্ত্রীর রক্ষণ ও পালনের ভার দিবে?”

এ কথার পর রাম আর আপত্তি করিতে পারিলেন না। ভ্রাতা লক্ষ্মণও রামের সঙ্গে বনগমনে কৃতসংকল্প হইলেন। লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে রামচন্দ্র পিতামাতা এবং অন্যান্য পুরবাসী গুরুজন-দিগকে অভিবাদন করিয়া চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনবাসে প্রস্থান করিলেন। দারুণ পুত্রশোকে রাজা দশরথ প্রাণত্যাগ করিলেন।

(৩)

পত্নী ও ভ্রাতাসহ রামচন্দ্র প্রথমে কিছুদিন চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করেন। এই স্থানে ভরত রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে দশরথের মৃত্যু-সংবাদ দেন। পরে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া রাজ্য গ্রহণ করিতে রামকে অনেক অনুরোধ করেন।

পিতার সত্য-পালনার্থ চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস না করিয়া রাম ফিরিতে অস্বীকার করিলেন। ভ্রাতৃবৎসল ধর্ম্মাত্মা ভরত অগত্যা রামের পাদুকা লইয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলেন। এই পাদুকা সিংহাসনে রাখিয়া রামের নামে রামের অনুপস্থিতি-কালের জন্য ভরত রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

ভরত অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলে রামচন্দ্র চিত্রকূট পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া গোদাবরী নদীর তীরবর্ত্তী দণ্ডকারণ্যে গমন করেন। দণ্ডকারণ্যের মধ্যে পঞ্চবটী নামে এক অতি সুন্দর বনপ্রদেশে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া রাম লক্ষ্মণ ও সীতা বাস করিতে লাগিলেন।

সরল প্রকৃতির শিশুর ন্যায় সীতা সরলপ্রাণা। প্রকৃতি তাঁহার সকল সৌন্দর্য্যে গোদাবরী তীরে পঞ্চবটী বনে ফুটিয়া-

ছিলেন। মায়ের ঘরে—মায়ের কোলে মেয়ের মত সীতা প্রাণ খুলিয়া আনন্দে খেলিতে লাগিলেন। প্রকৃতির প্রাণে যেন আপন প্রাণ মিশাইয়া দিলেন। নির্ম্মল বনের ফুলের মত সীতা পঞ্চবটীতে ফুটিয়া সৌন্দর্য্যে বন আলোকিত— সৌরভে বন আমোদিত করিয়া তুলিলেন। সরল মুক্ত বনের পাখীর সঙ্গে মুক্তপ্রাণে মুক্তকণ্ঠে সীতা গান করিতেন। আনন্দ-উচ্ছ্বাসে চঞ্চলচরণে আনন্দিত চঞ্চল মৃগশিশুর সঙ্গে খেলা করিতেন। প্রস্ফুটিত পদ্মবনে পদ্মিনী-রাণীর মত কখনও মিশিয়া যাইতেন। রামের সঙ্গে পাহাড়ে পাহাড়ে, নদীর তীরে, ফুলের বনে, অবাধে মনের সাধে ঘুরিতেন। ঝরণার কাছে বসিয়া গল্প করিতেন। ভগিনীর ন্যায়—সখীর ন্যায় মুনিকন্যাদের সঙ্গে স্নান করিতেন; ফুল তুলিতেন। এ সুখের কাছে কি রাজার ঘরের রাজসুখ?

চিরজীবন রামের সঙ্গে এমন বনে এমন সুখে থাকিতে পারিলে অযোধ্যার রাজত্বে কাজ কি? রাজপ্রাসাদ কি বনের গাছতলার মত? রাজগৃহের রত্নরাজি কি বনের ফুলের মত? রাজগৃহের শিক্ষিত গায়ক-গায়িকার তানলয়সংযুক্ত গান কি বনের পাখীর গানের মত? রাজগৃহের প্রমোদকানন কি বনের ফুলের মত? রাজগৃহের বিলাস-সঙ্গিনীরা কি মুনিকন্যাদের মত? রাজ-গৃহে কি এমন পাহাড় আছে? এমন নদী আছে? এমন পদ্মবন আছে? এমন সব গাছপালা আছে? রাজগৃহে কি রামের সঙ্গে তিনি এমন মুক্তভাবে রাত্রি-দিন বেড়াইতে পারেন, গল্প করিতে পারেন? জীবনের সকল সাধ—সকল আশা যেন সীতার পূরিল।

বনের প্রাণে যেন তাঁর প্রাণ মিশিয়া গেল। বনের ফুল যেন বনেই পূর্ণ-শোভায় ফুটিল। রাজগৃহের সুখ সুখ বলিয়া তাঁহার আর মনে হইত না।

কিন্তু হায়! এ সুখ সীতার শীঘ্রই ফুরাইল। সহসা ঘোর ঝটিকার আবর্ত্তে বনের কুসুম বনবিচ্যুত হইয়া ঘোরগর্জ্জী ভীমতরঙ্গবিক্ষোভিত মহাসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইল।

(৪)

লঙ্কার রাক্ষস-রাজা রাবণের ভগিনী সূর্পণখা বিধবা হইয়া দণ্ডকারণ্যে বাস করিত। রাবণের আদেশে তাহার মাসী রাকার পুত্র খর নামে এক দুর্দ্দান্ত রাক্ষস এবং তাহার সেনাপতি দূষণ চৌদ্দহাজার রাক্ষসসৈন্য লইয়া সূর্পণখার রক্ষণ ও আদেশ পালন করিত।

এক দিন বেড়াইতে বেড়াইতে সূর্পণখা পঞ্চবটীতে আসিল। রামের অনিন্দ্যসুন্দর রূপে মুগ্ধ হইয়া রাক্ষসী, সুন্দরী নারীর রূপ ধরিয়া রামের প্রণয় ভিক্ষা করিল। রামের প্রত্যাখ্যানে সীতাকেই তাহার প্রণয়-লাভের অন্তরায় মনে করিয়া রাক্ষসী তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। তখন রামের আদেশে লক্ষ্মণ সূর্পণখার নাক কাণ কাটিয়া দিলেন।

ভগিনীর এই অপমানের প্রতিশোধের জন্য খর ও দূষণ চৌদ্দহাজার রাক্ষস লইয়া রামকে আক্রমণ করিল। কিন্তু রাম সকলকেই যুদ্ধে নিহত করিলেন। সূর্পণখা তখন লঙ্কায় রাবণের

কাছে গেল। রামের কথা, লক্ষ্মণের কথা, সীতার কথা বলিয়া সূর্পণখা রাবণকে কহিল,—"সীতার মত সুন্দরী আর পৃথিবীতে নাই। তোমার যত রাণী আছে সীতার দাসী হইবার যোগ্যও কেহ নয়। তোমার জন্য আমি সীতাকে আনিতে গিয়াছিলাম। তাই লক্ষ্মণ আমার নাক কাণ কাটিয়া দিয়াছে। খর দূষণ আর যত রাক্ষস বনে ছিল, সকলকে রাম মারিয়া ফেলিয়াছে। দণ্ডকারণ্যে আর তোমার আধিপত্য নাই। তোমার একমাত্র ভগিনী এইরূপ লাঞ্ছিতা হইয়াছে। যদি প্রতিশোধের শক্তি তোমার থাকে, তবে এখনই যাও; সীতাকে আনিয়া তুমি নিজে বিবাহ কর। ইহাতে রাম লক্ষ্মণের যথেষ্ট অপমান করা ও শাস্তি দেওয়া হইবে। তোমারও অদ্বিতীয় সুন্দরী নারীরত্ন লাভ করা হইবে।"

সূর্পণখার কথায় রাবণ মারীচ নামে এক মায়াবী রাক্ষসকে সঙ্গে লইয়া পুষ্পকরথে দণ্ডকারণ্যে গেল। রাবণের আকাশগামী এক রথ ছিল, তাহারই নাম পুষ্পক। রাবণের পরামর্শমত মারীচ স্বর্ণমৃগের রূপ ধরিয়া রামের কুটীরের সম্মুখে বিচরণ করিতে লাগিল। অমন সুন্দর সোণার হরিণ দেখিয়া সীতার তাহাকে ধরিতে ইচ্ছা হইল। তিনি রামকে কহিলেন,—"এই হরিণটি আমায় ধরিয়া দাও। আমি পুষিব। যদি জীবিত না ধরিতে পার, তবে মারিয়াই আনিও, ইহার সুন্দর চর্ম্ম আমাদের ঘরে থাকিবে।"

রাম, লক্ষ্মণের উপর সীতার রক্ষণের ভার দিয়া ধনুর্ব্বাণ লইয়া হরিণের পশ্চাতে গেলেন। হরিণ ছুটিয়া পলাইল।

হরিণ বনের মধ্যে অনেকদূর চলিয়া গেল। রামও পশ্চাতে পশ্চাতে গেলেন। হরিণ ধরিবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া রাম একটি বাণ ছুঁড়িলেন। হরিণ তখন ঠিক রামের মত স্বরে "কোথায় ভাই লক্ষ্মণ, প্রাণ যায় রক্ষা কর!" চীৎকার করিয়া এই কথা বলিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

কুটীরে রামের সেই কাতর-স্বর শুনিয়া সীতা অস্থির হইয়া উঠিলেন। তিনি লক্ষ্মণকে রামের সাহায্যার্থে যাইতে আদেশ করিলেন।

লক্ষ্মণ জানিতেন, মহাবীর রামচন্দ্রের কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। কোন মায়াবী রাক্ষস কোন দুরভিসন্ধিতে ঐরূপ শব্দ করিয়াছে। লক্ষ্মণ সীতাকে একা কুটীরে ফেলিয়া যাইতে চাহিলেন না।

রামের বিপদ-আশঙ্কায় সীতা এত অধীর হইয়াছিলেন, যে তখন তাঁহার ভাল মন্দ জ্ঞান ছিল না। তিনি লক্ষ্মণকে বড় কটূক্তি করিলেন। এমন কটূক্তি, যে, সীতার মুখে তাহা কখনও শোভা পায় না। লোকে বলিয়া থাকে, আপদকালে বিপরীত বুদ্ধি হয়; সীতারও তাহাই হইয়াছিল। নতুবা তাঁহার মত সুশীলা, শান্তপ্রকৃতি, কোমলপ্রাণা, লক্ষ্মণের প্রতি চির-স্নেহময়ী রমণীর মুখ হইতে ওরূপ কটূক্তি কেন বাহির হইবে? সীতার কটূক্তিতে ব্যথিত হইয়া লক্ষ্মণ রামের অন্বেষণে গেলেন।

ভিক্ষুক সন্ন্যাসীবেশে রাবণ অন্তরালে ছিল। অভীষ্ট সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া সে কুটীরের সম্মুখে আসিল। সন্ন্যাসী দেখিয়া

সীতা তাহাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন দিলেন এবং আহারের জন্য ফল-মূল আনিয়া দিলেন। রাবণ আত্মপরিচয় দিয়া সীতাকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিল। ক্রুদ্ধ সিংহিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া সীতা কহিলেন,—"পাপিষ্ঠ! তুই কে, যে, সাহস করিয়া আমাকে এমন কথা বলিস্! মহা-পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ়, মহাসমুদ্রের ন্যায় স্থির, ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রান্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম আমার স্বামী। শৃগাল হইয়া তুই সিংহিনীকে লাভ করিতে চাস্? রাম সিংহ, তুই শৃগাল। রাম সমুদ্র, তুই ক্ষুদ্র নদী। রাম চন্দন, তুই কর্দ্দম। রাম হস্তী, তুই বিড়াল। রাম স্বর্ণ, তুই লৌহ। রাম গরুড়, তুই কাক! তোর এত আস্পর্দ্ধা, যে, সেই রামের স্ত্রীকে তুই এমন কথা বলিস্? নিতান্ত মৃত্যু নিকট বলিয়াই তোর এই কুমতি হইয়াছে। যদি প্রাণের বাসনা থাকে, তবে এখনই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ'! ইন্দ্রের শচীকে অপমান করিয়াও তোর যদি নিস্তারের সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু আমাকে অপমান করিলে কিছুতেই তোর রক্ষা থাকিবে না, এ কথা নিশ্চয় জানিস্!"

ইচ্ছাক্রমে সীতা তাহার সঙ্গে যাইবেন না বুঝিতে পারিয়া রাবণ বলপূর্ব্বক তাঁহাকে রথে তুলিয়া আকাশে উঠিল। সীতা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিলেন,—"কোথায় রাম, কোথায় লক্ষ্মণ! দুরাত্মা রাক্ষস সীতাকে লইয়া যায় তোমরা দেখিলে না! শীঘ্র এস, আমাকে রক্ষা কর! হায় তোমরা কতদূরে আছ,—আমার কথা কি শুনিতে পাইবে? পঞ্চবটী!

তুমি রামকে আমার এই বিপদের সংবাদ দিও। গোদাবরী নদী! তোমাকে নমস্কার করি, তুমি রামকে জানাও,—রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে। বনদেবতাগণ! তোমাদিগে প্রণাম করি, তোমরা রামকে সংবাদ দিও, তাঁ'র স্ত্রীকে রাবণ লইয়া যাইতেছে। বনবাসী বৃক্ষগণ! মৃগ পক্ষীগণ! এতদিন তোমাদের সঙ্গে ছিলাম, আজ রাবণ আমাকে লইয়া যায়, তোমরা রামকে এই সংবাদ দাও।"

পথে যাইতে যাইতে সীতা জটায়ুপক্ষীকে দেখিলেন। জটায়ু গরুড়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অরুণের পুত্র। দশরথের সঙ্গে তাহার সখ্য ছিল। সীতা জটায়ুকে কহিলেন,—"আর্য্য জটায়ু! রাবণ আমাকে লইয়া যায়, রাম লক্ষ্মণ কুটীরে নাই, তুমি আমাকে রক্ষা কর।"

জটায়ুর সঙ্গে রাবণের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। জটায়ুকে মৃতপ্রায় আহত করিয়া রাবণ সীতাকে লইয়া চলিল। পথে সীতা দেখিলেন, এক পর্ব্বতের উপরে সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণ বসিয়া আছে। যদি ইহারা রামকে সংবাদ দিতে পারে, এই আশায় সীতা তাঁহার অঙ্গের অলঙ্কার এবং উড়নী নীচে ফেলিয়া দিলেন। সমুদ্র পার হইয়া রাবণ সীতাকে লইয়া লঙ্কায় পৌঁছিল। রাবণের রাজপুরী সংলগ্ন একটি সুন্দর অশোকবন ছিল। সীতাকে রাবণ সেইখানে রাখিল। ভয় দেখাইয়া, উৎপীড়ন করিয়া, যে ভাবে পারে সীতাকে বশীভূত করিয়া দিবে, এই জন্য কতকগুলি দুর্দ্দান্ত রাক্ষসীকে সর্ব্বদা সীতার কাছে

থাকার জন্য চেড়ী নিযুক্ত করিল। রাবণের প্রলোভন, চেড়ী-গণের উৎপীড়ন, কিছুতেই সতীলক্ষ্মী রামগতপ্রাণা সীতার মন চঞ্চল হইল না। রামের জন্য কাতর হইয়া, রামের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া সীতা অশোকবনে দিন কাটাইতে লাগিলেন। 180654

(৫)

এদিকে স্বর্ণমৃগ বধ করিয়া রাম কুটীরে ফিরিলেন। রামের ভয় হইতেছিল, মৃত্যুকালে মৃগের চীৎকার শুনিয়া পাছে লক্ষ্মণ সীতাকে ফেলিয়া আসে। মৃগ ঐরূপ চীৎকার করা অবধিই তাঁহার মনে নানাবিধ আশঙ্কা হইতেছিল। পথে লক্ষ্মণকে দেখিয়া তাঁহার বড় ভয় হইল। দ্রুতপদে দুই ভাই কুটীরে আসিয়া দেখিলেন, সীতা নাই। বুঝিলেন সর্ব্বনাশ হইয়াছে। মায়াবী রাক্ষসেরা মায়াবলে তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া সীতাকে কোথায় লইয়া গিয়াছে। চারিদিকে দুইজনে সীতার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। আহত জটায়ুর সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। রামকে রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণের সংবাদ দিয়া জটায়ু প্রাণত্যাগ করিল। জটায়ুর অগ্নিসৎকার করিয়া, রাম লক্ষ্মণ, সীতার অনু-সন্ধানে দক্ষিণদিকে চলিলেন। ক্রমে কিষ্কিন্ধ্যাদেশে আসিয়া সুগ্রীব, হনূমান্ প্রভৃতি বানরগণের সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল।

সুগ্রীব, আকাশপথে রাবণ যে সীতাকে লইয়া গিয়াছে, তাহা বলিল এবং রামকে সীতার অলঙ্কার ও উড়নী দেখাইল। সীতার উদ্ধারের জন্য রাম, সুগ্রীবের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

সুগ্রীবকে রাজ্যচুত করিয়া সুগ্রীবের ভ্রাতা বালী কিষ্কিন্ধ্যা শাসন করিতেছিল। রাম বালীকে হত্যা করিয়া সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যারাজ্যে অধিষ্ঠিত করিলেন এবং সুগ্রীব, সীতা উদ্ধারের জন্য সমস্ত বানরসেনা লইয়া রামের সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইল।

রাবণ কোন্‌দিকে কোথায় নিয়া সীতাকে রাখিয়াছে, অনুসন্ধানের জন্য চারিদিকে সুগ্রীব চর পাঠাইলেন। মহাবীর হনূমান্ দক্ষিণদিকে গেলেন। এক লম্ফে সমুদ্র পার হইয়া হনূমান্ লঙ্কায় গেল। রাত্রে সকলে ঘুমাইলে বাড়ীর ছাতের উপর দিয়া গিয়া রাবণের পুরীতে ও লঙ্কার বড় বড় রাক্ষসদের পুরীতে সে অনেক খুঁজিল। অনেক সুন্দরী স্ত্রীলোক সে দেখিল। সকলে সুন্দর অলঙ্কারে ও কাপড়ে সাজিয়া সুন্দর বিছানায় ঘুমাইয়া আছে। কিন্তু হনূমান্ ভাবিল, "এরা কেউ সীতা নয়। সীতা কি রাম ছাড়া হইয়া এমন সাজিয়া গুজিয়া, এমন সুন্দর বিছানায় এমন নিশ্চিন্ত ঘুমাইয়া থাকিতে পারেন? আর এরা যতই সুন্দর হউক, তবু যেন তেমন নয়। এদিগে দেখিয়া মা বলিয়া ডাকিতে কারো ইচ্ছা হয় না। ছি, রামের সীতা কি এমন?"

হনূমান্ শেষে অশোক বনে গেল। এ গাছে ও গাছে ঘুরিয়া শেষে দেখিল, একটি অশোক গাছের নীচে অশোকবন আলো করিয়া এক দেবী বসিয়া আছে। দেবীর কেশ রুক্ষ, সর্ব্বাঙ্গ ধূলিময়, বসন ছিন্ন, চক্ষুভরা জল; মা'র মুখে করুণ "রাম রাম" ধ্বনি। চারিধারে রাক্ষসী চেড়ীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া কত

তাড়না করিতেছে। হনূমান্ বুঝিল, এই সীতা। সে গাছের উপরের ঘন ডাল পাতার মধ্যে লুকাইয়া রহিল। চেড়ীরা এদিক ওদিক গেলে, নামিয়া আসিয়া সীতাকে প্রণাম করিয়া নিজের পরিচয় ও রামের সংবাদ তাঁহাকে দিল। অনেক দিন পরে রামের সংবাদ পাইলেন, রামকে আপনার সংবাদ দিতে পারিবেন, এই সব ভাবিয়া সীতা অনেক আশ্বস্ত হইলেন। চক্ষের জল মুছিয়া, হনূমান্‌কে আশীর্ব্বাদের নিদর্শন স্বরূপ একটি মণি দিয়া সীতা কহিলেন,—"বাছা, এই মণি লইয়া তুমি রামকে দিও। তাহা হইলে তুমি যে আমার সাক্ষাৎ পাইয়াছ তাহা তিনি বুঝিতে পারিবেন। তাঁহাকে বলিও, বেসি দিন এ অবস্থায় আমি জীবিত থাকিতে পারিব না। তিনি যেন সত্বরই আমায় উদ্ধার করেন।"

হনূমান্ কহিল,—"মা, অত দিনই বা অপেক্ষা করার তোমার কি দরকার? কেন আর এখানে কষ্ট পাইবে? আমার পিঠে চড়। একলাফে সমুদ্র পার হইয়া এখনি তোমাকে লইয়া রামের কাছে যাইতেছি।" কিন্তু সীতা কহিলেন,—"বাছা, আমি জানি তোমার এমন শক্তি আছে, যে, তুমি আমাকে নিরাপদে এখান হইতে লইয়া যাইতে পার। কিন্তু রাবণ আমাকে হরণ করিয়া রামের বড় অপমান করিয়াছে। তিনি মহৎবংশজাত মহাবীর; যুদ্ধে রাবণকে পরাস্ত করিয়া আমাকে উদ্ধার করিলেই তাঁ'র মান রক্ষা ও এই অপমানের প্রতিশোধ হয়। রাক্ষস যে তাঁর স্ত্রী হরণ করিয়াছে, এ কলঙ্ক তাঁ'র আর কিছুতেই যাইবে না। তাঁ'র মুখ ছোট রাখিয়া চোরের মত আমি লঙ্কা হইতে যাইব না।

ধর্ম্মনাশের ভয় আমি করি না।—কাহারও সাধ্য নাই, দেহে জীবন থাকিতে আমার ধর্ম্ম নাশ করিতে পারে।”

সীতাকে প্রণাম করিয়া হনূমান্ বিদায় হইল। যাইবার আগে তাহার ইচ্ছা হইল, রাক্ষসগণকে তাহার পরাক্রম একটু দেখাইয়া, তাহাদের পরাক্রম একটু বুঝিয়া যায়। এই মনে করিয়া সে রাবণের প্রমোদবন ভাঙ্গিতে লাগিল। রাবণের আদেশে অনেক রাক্ষস আসিয়া হনূমান্‌কে আক্রমণ করিল। সিংহনাদে হনূমান্ রামের জয়কার তুলিয়া রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিল। আবার আরও রাক্ষসেরা আসিল। তখন, রাবণকে দু’টা কথা শুনাইবে বলিয়া হনূমান্ উহাদের কাছে ধরা দিল। রাবণের নিকট নীত হইয়া হনূমান্ আপনাকে রামের দূত বলিয়া পরিচয় দিল। সীতাহরণের জন্য রাবণকে অনেক গালি দিয়া কহিল,—“যদি মঙ্গলের বাসনা তোমার থাকে, তবে সীতাকে ফিরাইয়া দাও। রামের পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর।”

ক্রোধে রাবণ যত অনুচরকে হনূমানের লাঙ্গুলে কাপড় জড়াইয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিতে আদেশ করিল। সীতার বরে হনূমানের লেজ পুড়িল না। বরং লাফাইয়া লাফাইয়া গৃহ হইতে গৃহের উপর গিয়া লেজের আগুনে হনূমান্ লঙ্কা পোড়াইয়া ছারখার করিল। সীতার সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ করিয়া আবার একলাফে সমুদ্র পার হইয়া হনূমান্ রামের নিকটে ফিরিয়া আসিল।

বানর-সেনার সাহায্যে সাগরের উপর সেতু বাঁধিয়া রাম লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন। ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্তে, যে স্থানে সেতু বাঁধিয়া রাম লঙ্কায় যান, সেই স্থান "সেতুবন্ধ রামেশ্বর" নামে মহাতীর্থে পরিণত হইল।

রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি ভ্রাতার অধর্ম্মে দুঃখিত হইয়া সীতাকে ফিরাইয়া দিয়া রামের সঙ্গে সন্ধি করিবার জন্য রাবণকে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু ক্রোধে রাবণ তাঁহাকে পদাঘাতে দূর করিয়া দিল। ব্যথিত হৃদয়ে বিভীষণ রামের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। লঙ্কায় রাক্ষসদের সঙ্গে রামের অনেক দিন যুদ্ধ হইল। রাবণের ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ, পুত্র বীরবাহু—অতিকায়—মেঘনাদ প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসগণ একে একে নিহত হইল। শেষে রাবণ নিজেও রামের হস্তে প্রাণত্যাগ করিল।

(৬)

রাবণ-বধের পর হনূমান্ শুভসংবাদ লইয়া অশোকবনে গেল। আনন্দের সংবাদে সীতা হর্ষের উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া ফেলিলেন। কোন কথা কহিতে পারিলেন না। হনূমান্ বিস্মিত হইয়া কহিল,—"একি মা, তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমার সঙ্গে কথা কহিতেছ না কেন?" আত্মসম্বরণ করিয়া একটু পরে সীতা কহিলেন,—"বাছা, অনেক দিন দুঃখের পর আজ রামের এই বিজয় সংবাদে, আনন্দে আমি ধৈর্য্যহারা

হইয়াছিলাম। আজ তুমি যে প্রিয় সংবাদ দিলে, তোমাকে কি পুরস্কার দিব, জানি না। ত্রিভুবনে এমন ধন দেখি না, যাহা দ্বারা তোমার কাজের প্রতিদান হয়। এই পৃথিবীরাজ্যও তোমার উপযুক্ত পুরস্কার হয় না।"

হনূমান্ কহিল,—"মা তুমি আজ সুখী হইলে, এই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। তোমার এই স্নেহ-মাখা কথাগুলি স্বর্গের রাজ্য অপেক্ষাও আমার কাছে মূল্যবান্ বলিয়া মনে হইতেছে।"

সীতাকে প্রণাম করিয়া হনূমান্ আবার কহিল,—"মা, ওই রাক্ষসী চেড়ীগুলা এতদিন তোমাকে অনেক দুঃখ দিয়াছে। তুমি আজ্ঞা কর, আমি এখনি ওগুলাকে মারিয়া ফেলি।"

সীতা কহিলেন,—"বাছা, দাসীরা প্রভুর বশ। প্রভু যে আদেশ করেন, তা'ই তাহারা করে। রাবণের আজ্ঞাতেই ইহারা আমাকে উৎপীড়ন করিয়াছে। কেন ইহাদিগকে শাস্তি দিবে? নিজ নিজ কর্ম্ম ফলেই লোকে দুঃখ পাইয়া থাকে। আমি আমার নিজের কর্ম্ম-দোষেই এখানে এই দুঃখ পাইয়াছি। ইহাদের দোষ কি? রাবণ যতদিন ছিল, তাহার কথায় উহারা আমাকে কষ্ট দিয়াছে। আহা, আজ দেখ, উহারা ভয়ে দূরে সরিয়া যাইতেছে। আমার উহাদের উপর কোন ক্রোধ নাই। তুমি উহাদিগে মার্জ্জনা কর। জগতে সকলেরই অপরাধ হইয়া থাকে; তাই পরস্পর পরস্পরের অপরাধ ক্ষমা করাই ধর্ম্ম।"

সীতার বচনে পরিতৃপ্ত এবং পুলকিত হনূমান্ রাক্ষসীগণকে ক্ষমা করিল।

রামের আদেশে সীতাকে নিবার জন্য বিভীষণ আসিলেন। স্নান করিয়া দিব্য বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া সীতা রাম-দর্শনে চলিলেন। রামকে প্রণাম করিয়া সীতা সলজ্জভাবে নতমুখে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু, রাম তাঁহাকে কোন সাদর সম্ভাষণ করিলেন না! গম্ভীরভাবে কঠোর বাক্যে কহিলেন,—"সীতা, রাবণ তোমাকে হরণ করিয়াছিল। সেই অপমানের প্রতিশোধের জন্য তাহাকে সবংশে নিধন করিয়া তোমাকে উদ্ধার করিলাম। মানী পুরুষের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিয়াছি; কিন্তু রাবণ তোমাকে বলপূর্ব্বক দশমাসকাল তাহার গৃহে রাখিয়াছে, তুমি বিশুদ্ধ আছ এরূপ সম্ভাবনা মনে করি না। এ অবস্থায় তোমাকে গ্রহণ করিয়া আমার মহৎবংশ কলঙ্কিত করিতে পারি না। তোমার যেখানে ইচ্ছা হয় যাইতে পার, যে ভাবে থাকিতে ইচ্ছা হয়, থাকিতে পার।"

যদি বজ্রপাত হইত, সীতা তাহা সহিতে পারিতেন। যদি সংসারের আর যত রকম বিপদ, নিন্দা, ঘৃণা, সমস্ত একত্র হইয়া সীতার উপর পড়িত, সীতা তাহাও সহিতে পারিতেন।—কিন্তু, রামের এই কথাগুলি সীতার অন্তরের অন্তরে গিয়া আগুনের তীরের মত বিঁধিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সীতা কহিলেন,—"আর্য্যপুত্র, ইতর লোকে ইতর স্ত্রীকে যেরূপ কথা বলে, মহাপুরুষ হইয়া কেন সেইরূপ কঠিন ঘৃণিত বাক্যে আমাকে ব্যথা দিতেছ? ইতর স্ত্রীর মত, রাবণের ঘরে ছিলাম বলিয়াই কি আমি রাবণের বশীভূত হইব? আমি অবলা স্ত্রীলোক, দুর্দ্দান্ত রাবণ বলপূর্ব্ব আমার

অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে, বাধা দিবার শক্তি আমার ছিল না, তাহাতে কি আমার কোন অপরাধ হইতে পারে? শরীর আমার অধীন নয়; সেই শরীর সে স্পর্শ করিয়াছে সত্য, কিন্তু আমার হৃদয়—যা'র উপর সকল অবস্থাতেই আমার কর্তৃত্ব আছে—সে হৃদয় কি সে দুরাচার স্পর্শ করিতে পারিয়াছে? সে হৃদয় আমার চিরদিন তোমারই অনুরক্ত—তোমারই ভক্ত। জগতে কাহারও সাধ্য নাই, একমুহূর্ত্তের জন্যও সে হৃদয়ে তোমা বই অন্যের চিন্তা আনিতে পারে। বহুদিন তোমার দাসী সঙ্গে রহিয়া তোমার সেবা করিয়াছে; আমার হৃদয় কিরূপ, চরিত্র কিরূপ, তাহা কি তুমি এখনো বুঝিতে পার নাই? যে দোষের আশঙ্কা করিয়া তুমি আমাকে ত্যাগ করিতেছ, সে দোষ আমাতে কি কখন সম্ভব বলিয়া তোমার মনে হইতে পারে! রাবণের পাশব বলে আমার দেহ যদি সেরূপ কোন কলঙ্ক স্পর্শ করিত, তবে জীবিত সেই দেহ লইয়া কি সীতা আজ তোমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত?"

রাম কোন কথা কহিলেন না। তখন সীতা লক্ষ্মণকে কহিলেন,—"লক্ষ্মণ, কলঙ্কিনী নাম ধরিয়া এ প্রাণ রাখিতে আমার ইচ্ছা নাই। কলঙ্কিনী বলিয়া এই জনসমূহের সমক্ষে স্বামী আমাকে ত্যাগ করিলেন, প্রাণে আর আমার প্রয়োজন কি? তুমি শীঘ্র চিতা প্রস্তুত কর, অগ্নিতে দেহ বিসর্জ্জন করিয়া আজ সকল দুঃখের—সকল কলঙ্কের শেষ করি।"

ক্রোধভরে লক্ষ্মণ রামের দিকে চাহিলেন। রাম কোন কথা কহিলেন না। তখন লক্ষ্মণ চিতা প্রস্তুত করিলেন। চিতা

প্রজ্বলিত হইলে অগ্নিদেবকে প্রণাম করিয়া সীতা কহিলেন,—“যদি রাম হইতে আমার মন কখনো বিচলিত না হইয়া থাকে, তবে সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বশুদ্ধি হুতাশন আমাকে রক্ষা করিবেন। আমি শুদ্ধচরিত্রা হইলেও কলঙ্কিনী বলিয়া রাম আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, পাপপুণ্যের সাক্ষী ভগবান্ অগ্নিদেব আমাকে রক্ষা করুন। যদি কায়মনোবাক্যে রামকে কখনও অতিক্রম না করিয়া থাকি, তবে ত্রিলোকশুদ্ধি বিভাবসু আমাকে রক্ষা করুন।” এই বলিয়া সীতা জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিলেন।

সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল। রামচন্দ্র স্বীয় নিষ্ঠুরতার জন্য অনুতাপে দগ্ধ হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সতীর পুণ্যদেহ অগ্নিতে দগ্ধ হইল না। স্বয়ং মূর্ত্তিমান অগ্নিদেব চিতানল হইতে সীতাকে লইয়া বাহির হইলেন। সীতাকে রামের নিকট দিয়া অগ্নি কহিলেন,—“রাম, এই তোমার সীতাকে গ্রহণ কর। পাপের লেশমাত্রও ইঁহাতে স্পর্শ করে নাই। মিথ্যা কলঙ্কের ভয় করিয়া পতিব্রতা ধর্ম্মশীলা সাধ্বী স্ত্রীকে ত্যাগ করিও না।”

লজ্জিত হইয়া রাম সমাদরে সসম্মানে সীতাকে গ্রহণ করিলেন। বিভীষণকে লঙ্কার রাজ্যে অভিষেক করিয়া, রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ-সহ রাবণের পুষ্পকরথে উঠিয়া আকাশপথে নানাদেশ দেখিতে দেখিতে নিজের বনবাসে ফিরিয়া আসিলেন।—চতুর্দ্দশবৎসর পূর্ণ হইলে, অযোধ্যায় ফিরিয়া গিয়া ভরত-প্রদত্ত রাজ্য গ্রহণ করিয়া পরমসুখে রাজ্য ভোগ ও প্রজা পালন করিতে লাগিলেন।

(৭)

সীতা পঞ্চমাস গর্ব্ভবতী। গর্ব্ভাবস্থায় মাতা সন্তুষ্ট ও প্রফুল্লচিত্ত থাকিলে গর্ব্ভস্থ সন্তান সুস্থদেহ, প্রফুল্লচিত্ত ও উদার-চরিত্র হয়, চিরদিন এদেশের লোকের এই ধারণা আছে। তাই গর্ব্ভিণীর অভিলাষ পূর্ণ করিয়া তাঁ'র মন তুষ্ট রাখিবার জন্য চিরদিন এদেশের লোকে যত্ন করিয়া থাকে। বনবাসকালে তপোবনের সরল নির্ম্মল সুখ শান্তির কথা, মুনিকন্যাগণের শান্তিময় নির্ম্মল পবিত্র জীবনের স্নিগ্ধ মুক্ত আনন্দের কথা, রাজার মহিষী—রাজগৃহের গৃহিণী হইয়াও সীতা ভুলিতে পারেন নাই। গর্ব্ভাবস্থায় তাঁহার ইচ্ছা হইল, কিছুদিন তপোবনে থাকিয়া মুনিকন্যাগণের সঙ্গে তপোবনের শান্তিময় নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করেন। রামের নিকট প্রাণের এই ইচ্ছা তিনি জানাইলেন। স্নেহময় স্বামী রামচন্দ্রও গর্ব্ভবতী স্ত্রীর এই অভিলাষ পূরণে অনুমোদন করিলেন। কিন্তু এই বাসনাই সীতার সুখময় জীবনের কালস্বরূপ হইল। সহসা রামচন্দ্র শুনিলেন, অযোধ্যাবাসী প্রজারা, বহুদিন রাবণগৃহে ছিলেন বলিয়া সীতার কলঙ্ককীর্ত্তন করিতেছে! সীতাকে গ্রহণ করার জন্য রামের প্রতিও তাহারা অসন্তুষ্ট। তাহারা বলিত, রাম ও সীতার এই দৃষ্টান্তে তাহারাও ধর্ম্ম ও সম্মান রক্ষার জন্য তাহাদের কুলস্ত্রীদিগকে উপযুক্ত শাসনে রাখিতে পারিবে না।

রামচন্দ্র আদর্শ রাজা। প্রজার সন্তোষ, প্রজার রঞ্জনই রাজার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। এ কর্ত্তব্যের নিকট স্নেহ, মমতা, প্রেম, সুখ, সকলই বিসর্জ্জন দিতে হইবে। এ কর্ত্তব্য পালনের

জন্য প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় যাহা কিছু হইতে পারে, সকলই ত্যাগ করিতে হইবে। রামচন্দ্রও সীতাকে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। সীতা তাঁ'র প্রাণাধিক প্রিয়— সীতা তাঁ'র একমাত্র পত্নী,—সেকালের রাজারা অনেক বিবাহ করিতেন, কিন্তু তিনি সীতা ব্যতীত আর দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেন নাই,—সীতা-বিহনে তাঁহার জীবন সুখহীন, গৃহ শ্মশান হইবে ;—তবুও রাজা তিনি, প্রজারঞ্জনের জন্য সীতাকে ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। সীতা তপোবন দেখিতে চাহিয়াছেন, এই উপলক্ষ্যে, তাঁহাকে নিয়া মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে পরিত্যাগ করিয়া আসিবে, লক্ষ্মণকে এই আদেশ করিলেন। লক্ষ্মণ রামকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক মিনতি করিলেন, শেষে অনেক কাঁদিলেন। কিন্তু স্থিরপ্রতিজ্ঞ রামচন্দ্রের মন টলিল না। ভ্রাতৃসেবাব্রত লক্ষ্মণ অগত্যা এই দারুণ নিষ্ঠুরকার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন।

সীতা এসব কিছুই জানিলেন না। আনন্দিত চিত্তে তিনি লক্ষ্মণের সঙ্গে রথে চড়িয়া তপোবন-বাসে চলিলেন।

গঙ্গাতীরে মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে পৌঁছিয়া, লক্ষ্মণ, লজ্জায়, দুঃখে, অবনত মস্তকে কাঁদিতে কাঁদিতে রামের সেই মর্ম্মভেদী আদেশ সীতাকে জানাইলেন।

সীতা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন।

লক্ষ্মণের শুশ্রূষায় সংজ্ঞালাভ করিয়া, অনেকক্ষণ বসিয়া মুখ লুকাইয়া সীতা নিজের মনে কাঁদিলেন। পরে একটু আত্মসম্বরণ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন,—"লক্ষ্মণ, বিধাতা দুঃখভোগের জন্যই

আমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাই মূর্ত্তিমান দুঃখরাশি আজ আমার নিকটে উপস্থিত হইল। পূর্ব্বজন্মে আমি অনেক পাপ করিয়াছিলাম; বোধ হয়, নিতান্ত প্রেমময়জীবন কোন দম্পতির বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলাম। তাই, যে দুঃখের উপরে আর দুঃখ হইতে পারে না,—জীবনের মত সেই স্বামী-বিরহদুঃখ আমার ভাগ্যে উপস্থিত হইল! লক্ষ্মণ, বনবাসে আমি কাতর নই। স্বামীর সঙ্গে ইচ্ছা করিয়াই তো বনবাসে গিয়াছিলাম। স্বামী সঙ্গে ছিলেন, একদিনের তরেও বনবাস দুঃখ বলিয়া মনে করি নাই। কিন্তু, আজ একাকিনী এই বিজন বনে কা'র মুখের দিকে চাহিব? ভীত হইলে কে আমার ভয় দূর করিবে? ক্লান্ত হইলে কা'র মুখ চাহিয়া কা'র মুখের কথা শুনিয়া, আমি ক্লান্তি দূর করিব? রাম মহৎচরিত্র পরম ধার্ম্মিক মহাপুরুষ। বনবাসী মুনিগণ যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন,—'কি দোষে এমন রাম তোমায় ত্যাগ করিয়াছেন?'—তখন আমি কি উত্তর দিব? লক্ষ্মণ, ইক্ষ্বাকুকুল-বংশধর রামের সন্তান আমার গর্ব্ভে, নহিলে তোমার সম্মুখে, এখানেই জাহ্নবী-জলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতাম।"

বলিতে বলিতে সীতার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, অবিরল অশ্রুধারায় তপোবনভূমি সিক্ত হইতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে, লক্ষ্মণকে কাঁদিতে দেখিয়া সীতা ধীরে ধীরে কহিলেন,—"লক্ষ্মণ, কাঁদিও না। তোমার দোষ কি? রাজা তোমাকে যে আদেশ করিয়াছেন, সে আদেশ তুমি পালন করিবে। আমি রামের হৃদয় জানি। তিনি কখনো আমাকে

অপরাধিনী মনে করিয়া ত্যাগ করেন নাই। তিনি কখনো আমার প্রতি স্নেহশূন্য হন নাই। নিতান্ত রাজার কর্ত্তব্য পালনের জন্যই অনিচ্ছায় আমাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমি জানি আমার বিরহে আমার দুঃখের কথা ভাবিয়া তিনি বড়ই কাতর হইবেন। লক্ষ্মণ, তুমি তাঁ'কে সান্ত্বনা করিও। বলিও, সীতা কখনো তাঁহাকে এই নিষ্ঠুরতার জন্য অপরাধী মনে করিবে না। বলিও, এই বনে মনে মনে তাঁহার সীতা তাঁহারই পূজা করিবে, তাঁহারই মঙ্গল কামনা করিবে। লক্ষ্মণ, তুমি তাঁহাকে আমার প্রণাম জানাইও। বলিও, রাজধর্ম্ম পালন করিয়া তিনি যে অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিলেন, সীতা তাহাতেই আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করিবে। শোকে অধীর হইয়া তিনি যেন আপনার কর্ত্তব্য-পালনে কখনও বিমুখ না হন।"

সীতা আবার বলিলেন,—"লক্ষ্মণ, শ্বশ্রূদিগকে এবং অন্যান্য পুরবাসী গুরুজনদিগকে আমার প্রণাম জানাইবে। ভগিনী-দিগকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাইবে। নিজের কর্ম্মদোষে আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল তাই আমি ভোগ করিতেছি, আমার জন্য যেন কেহ দুঃখ না পান।"

অশ্রুপূর্ণলোচনে সীতার চরণবন্দনা করিয়া লক্ষ্মণ বিদায় হই-লেন! লক্ষ্মণ দৃষ্টির অতীত হইলে, ভূমিতে পড়িয়া কাতর-স্বরে সীতা রোদন করিতে লাগিলেন। সমস্ত তপোবন সীতার সেই আকুল ক্রন্দনে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সেই করুণ শব্দে চমকিত হইয়া শিষ্যগণসহ মহর্ষি বাল্মীকি আসিয়া সীতাকে দেখিতে পাইলেন।

মহর্ষি সীতাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া তাঁহাকে নিজের আশ্রমে লইয়া গেলেন। বাল্মীকির আশ্রমে যথাসময়ে সীতা, কুশ ও লবনামক যমজ পুত্রদ্বয় প্রসব করিলেন। এই দুই কমনীয় শিশুর অতুল সৌন্দর্য্যে বাল্মীকির তপোবন আলোকিত হইয়া উঠিল। রাজরাণী সীতা তপোবনের দীন কুটীরে তপস্বিনীবেশে রাজার তপস্বীপুত্র পালনে মনোনিবেশ করিলেন।

পঞ্চবটীতে বনবাসিনী সীতাকে আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু সেই সীতা, আর এই সীতা! এ-ও তপোবন, এখানেও মৃগশিশু খেলিতেছে, বনের পাখী গান করিতেছে, পদ্মবনে পদ্ম ফুটিতেছে, মধুর মলয়-হিল্লোলে তরুলতা নাচিয়া নাচিয়া ফুল ছড়াইতেছে। এখানেও মুনি-কন্যারা হাসিয়া গাইয়া স্নান করিতেছেন, ফুল তুলিতেছেন, মালা গাঁথিতেছেন। সেই সব আছে, কিন্তু সীতার পাশে রাম নাই, সেই সীতা আর নাই। সীতার খেলা নাই, গান নাই, হাসি নাই, পদ্মবনে ভ্রমণ নাই, মুনিকন্যাদের সঙ্গে আনন্দোচ্ছ্বল গান, ফুলতোলা ও মালা গাঁথা নাই। আহা, বালিকার মত সরল চঞ্চল প্রাণে রামের পাশে উচ্ছ্বসিত আনন্দে নিত্য ক্রীড়াময়ী সেই সীতা,--যেন বসন্তের কাননে, বসন্তের নবীন প্রভাত-কিরণে শ্যামল সহকার বেড়িয়া পুষ্পিত মাধবী লতা মলয় হিল্লোলে নাচিয়া নাচিয়া হাসিয়া হাসিয়া খেলিতেছিল। কিন্তু আজ প্রচণ্ড নিদাঘ তাপে শুকাইয়া মাটিতে লুটাইতেছে! সীতা আজ বনবাসী রামের আনন্দময়ী বনসঙ্গিনী নন, জীবনের মত স্বামীবিরহিনী, আশাহীন দুঃখে আত্মসমর্পিণী তপস্বিনী।

তপোবনের নিভৃত কুটীরে বিষাদ-মলিনা একাকিনী সীতা আজ হৃদয়ের সকল টুকু জীবন্ত স্নেহ দিয়া পুত্র পালনে নিয়োজিতা; বিষাদ-মলিন সুন্দর মুখখানি-ভরা আজ তপস্বিনীর ধর্ম্মবলে মাতার মাতৃস্নেহের নীরব শান্তিময় গাম্ভীর্য্য! সেই আনন্দের উচ্ছ্বাসময় সরল চঞ্চল চক্ষু দু'টিতে আজ কেবল স্নেহের ও বিষাদের অশ্রুময় মলিন হাসি! দূর অযোধ্যার সিংহাসনে কঠোর প্রজারঞ্জন ব্রত পরায়ণ রাম, কল্পনার নেত্রে তোমার সীতার এই মূর্ত্তি কখনো দেখিয়াছ? যদি দেখিয়া থাক, তবে জানি না, কোন মহৎ দেবত্বের বলে পাষাণ প্রাণে এই মূর্ত্তি ঢাকিয়া," জীবন বহন করিতেছ!

(৮)

কুশ ও লব ক্রমে বড় হইয়া উঠিলেন। বাল্মীকি তাঁহাদিগকে নানা শাস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন। রাম ও সীতার অপূর্ব্ব জীবনীসম্বলিত মহাকাব্য রামায়ণ রচনা করিয়া, বাল্মীকি, কুশ ও লবকে তাহা শিখাইলেন। তপোবনে মুনিগণের নিকট বালক ভ্রাতৃদ্বয় বীণা বাজাইয়া সুললিত স্বরে রামায়ণ গান করিত।

এদিকে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। সস্ত্রীক না হইলে কোন ধর্ম্মকার্য্যই সুসিদ্ধ হয় না, তাই পুরোহিত-গণ রামচন্দ্রকে আবার বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু, সীতাগতপ্রাণ রামচন্দ্র আবার বিবাহের কথা মনেও স্থান দিতে

পারিলেন না। সীতার এক স্বর্ণময়ী:প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া, সেই প্রতিমা সহ যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। অন্যান্য মুনিগণের ন্যায় যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া শিষ্যগণসহ বাল্মীকিও অযোধ্যায় আসিলেন; তাঁহার শিষ্যরূপে পরিচিত হইয়া কুশ ও লবও আসিলেন। সমবেত রাজগণ ও মুনিঋষিগণের সম্মুখে বাল্মীকির অনুরোধে কুশ লব রামায়ণ গান করিল। রামচন্দ্র জানিতে পারিলেন, গায়ক বালকদ্বয় তাঁহারই পুত্র।

পুত্রদ্বয়কে দেখিয়া, বাল্মীকির তপোবনে নির্ব্বাসিতা সীতার সকল অবস্থা, সকল কথা শুনিয়া, রামচন্দ্র দুঃখে বড় কাতর হইলেন। বাল্মীকির অনুরোধে আবার সীতাকে গ্রহণ করিতে তিনি স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু, প্রজাগণ পাছে দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হয়, তাই কথা হইল, সীতা সভার মধ্যে সকলের সমক্ষে নিজের নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে শপথ করিয়া প্রমাণ দেখাইবেন।

সীতা অযোধ্যায় আসিয়া বিভিন্নদেশীয় রাজগণ, মুনিঋষিগণ ও অযোধ্যার প্রজাবৃন্দপরিপূর্ণ সভায় দণ্ডায়মান হইলেন। বাল্মীকি তাঁহাকে পূর্ব্বকথিত শপথ ও প্রমাণের কথা কহিলেন।

নির্ম্মলচরিত্র হইয়াও সীতা অনেক দুঃখ পাইয়াছেন; লোকাতীত ধৈর্য্য সহকারে এপর্য্যন্ত সবই সহিয়াছেন, আবার রামের চরণে স্থান পাইবেন বড় আশা করিয়া সীতা অযোধ্যায় আসিয়াছিলেন। কিন্তু সহসা বহু জনপূর্ণ সভার মধ্যে এই শপথ ও প্রমাণের কথায় তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল, এ দারুণ অপমান কোমলপ্রাণা সতীর প্রাণে সহ্য হইল না।

কাহারও দিকে তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন না। পৃথিবীর দুহিতা আজ বড় দুঃখে, জননী পৃথিবীর পানে চাহিয়া তাঁহার কোলে দুঃখময় জীবনের শেষ শান্তি, শেষ আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। ধীর করুণস্বরে সীতা কহিলেন,—"জীবনে রাম ভিন্ন আমি কখনো আর কাহাকেও মনে স্থান দিই নাই, এই ধর্ম্মবলে, মা পৃথিবী! তোমার গর্ভে আমায় স্থান দাও। আমি কায়মনোবাক্যে জীবন ভরিয়া কেবল রামেরই পূজা করিয়াছি, এই সত্যবলে, ভগবতী বসুন্ধরা, তোমার কোলে আমায়—আজ তোমার এই দুঃখিনী কন্যাকে—নাও মা! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার জীবন অকলঙ্কিত; স্বামী রামচন্দ্র ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের চিন্তা স্বপ্নেও কখনো মনে করি নাই, আমার এই শপথের প্রমাণ স্বরূপ, মা ধরিত্রি, তুমি এখনই দ্বিধা হও, অভাগিনীকে তোমার গর্ভবিবরে স্থান দাও।"

দেখিতে দেখিতে সীতার সমক্ষে ধরণীবক্ষ বিদীর্ণ হইল। মূর্ত্তিমতী পৃথিবীদেবী দিব্য সিংহাসনে আবির্ভূতা হইয়া দুহিতা সীতাকে কোলে লইয়া মুহূর্ত্তে অন্তঃর্হিতা হইলেন।

সাবিত্রী।

(১)

বঙ্গীয় মহিলাগণ সকলেই সাবিত্রীর নাম জানেন। সকলেই জানেন, সতীত্ববলে ইনি মৃত পতিকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া আদর্শ-সতীরূপে ভারতে বিখ্যাত হইয়াছেন। তাই জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে—যে তিথিতে মৃত সত্যবান্ সাবিত্রীর ধর্ম্মবলে জীবন লাভ করিয়াছিলেন, সেই পুণ্য তিথিতে বঙ্গীয় গৃহলক্ষ্মীরা পতির দীর্ঘজীবন কামনায় অতি কঠোর সাবিত্রীব্রত করিয়া থাকেন।

প্রাচীন কালে মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন। সন্তান-কামনায় ইনি বৈদিক সাবিত্রীদেবীর আরাধনা করিয়া তাঁহার বরে এক কন্যারত্ন লাভ করেন। ইঁহারই নাম সাবিত্রী। বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রতিভা ও ধর্ম্মের তেজে পরম রূপবতী সাবিত্রীকে জ্বলন্ত সূর্য্যের ন্যায় বোধ হইত। তাই সাহস করিয়া কেহই তাহাকে বিবাহ করিতে আসিল না। অশ্বপতি বড় চিন্তিত হইলেন। একদিন তিনি কন্যাকে ডাকিয়া কহিলেন,—“মা, তোমার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইল, অথচ কোন রাজাই সাহস করিয়া তোমার বিবাহার্থী হইলেন না। আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া যোগ্য বর মনোনয়ন কর।”

পিতার আদেশে সাবিত্রী, বৃদ্ধ মন্ত্রীগণ এবং রক্ষক-অনুচর-বর্গসহ দেশপর্য্যটনে বাহির হইলেন।

এই সময়ে শাল্বদেশে দ্যুমৎসেন নামে এক রাজা ছিলেন; তাঁহার একমাত্র পুত্র সত্যবান্ যখন নিতান্ত শিশু, তখন রাজা অন্ধ হইলেন। রাজা অন্ধ, পুত্রও শিশু, শত্রুগণ এই অবসরে দ্যুমৎসেনের রাজ্য হরণ করিল। দ্যুমৎসেন, স্ত্রী ও শিশু পুত্র-সহ কোন তপোবনে বাস করিতে লাগিলেন। সত্যবান্ এখন বলিষ্ঠ, তেজস্বী, পরমসুন্দর ধর্ম্মপরায়ণ যুবক।

সাবিত্রী নানা দেশ ঘুরিলেন। অনেক রাজা দেখিলেন; কিন্তু মনোমত বর কোথাও পাইলেন না। অবশেষে, তপোবনে ব্রহ্মতেজ ও ক্ষত্রিয়তেজে উদ্ভাসিত তপস্বী রাজপুত্র সত্যবান্‌কে দেখিয়া, তিনি মুগ্ধ হইলেন। মনে মনে তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিয়া, সাবিত্রী পিতার নিকট ফিরিয়া গেলেন।

তখন দেবর্ষি নারদ, রাজা অশ্বপতির নিকটে উপস্থিত ছিলেন। সাবিত্রী উভয়ের চরণ বন্দনা করিয়া সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিলেন।— কন্যা একজন রাজ্যচ্যুত বনবাসী রাজার পুত্রকে স্বামী মনোনীত করিয়াছে শুনিয়া, অশ্বপতি ক্ষুণ্ণ হইলেন। নারদ সত্যবানের অশেষ গুণবর্ণনা করিয়া কহিলেন,—"সত্যবান্ রূপে, গুণে, ধর্ম্মে ও বলবীর্য্যে সর্ব্বপ্রকারেই সুপাত্র। কিন্তু ইহার একটি বিশেষ দোষ আছে। সুতরাং তোমার কন্যা ইহাকে মনোনীত করিয়া ভাল করে নাই।"

অশ্বপতি সত্যবানের এই দোষের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, নারদ কহিলেন,—"সত্যবান্ অল্পায়ু। আজ হইতে এক বৎসর যেদিন পূর্ণ হইবে, সেই দিন সত্যবানের মৃত্যু হইবে।"

অশ্বপতি ভীত হইয়া সাবিত্রীকে কহিলেন,—"মা, তবে এ বিবাহে কাজ নাই। সত্যবানের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কর। জানিয়া শুনিয়া কেন বৈধব্যকে বরণ করিবে? অন্য স্বামী মনোনয়ন কর।"

সাবিত্রী কহিলেন,—"পিতা, গাছের ফল একবারই পড়ে, 'দিলাম' এই বাক্য একবারই বলে। সত্যবান্ অল্পায়ুই হউন আর দীর্ঘায়ুই হউন, সগুণই হউন আর নির্গুণই হউন, একবার যখন তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তখন তিনিই আমার পতি। মনেই কর্ম্মের উৎপত্তি, বাক্যে কেবল তাহা কথিত হয়, কার্য্যে অনুষ্ঠিত হয়। মনে যখন তাঁহাকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তখন তাঁহারই সঙ্গে আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। স্বামী ত্যাগ করিয়া অন্যপুরুষকে কি প্রকারে বরণ করিব? অল্পায়ু বলিয়া কোন্ সাধ্বী স্ত্রী স্বামী ত্যাগ করিয়া থাকে? যদি বৈধব্যই অদৃষ্টে থাকে, ভোগ করিতেই হইবে। জীবন মরণ সকলের পক্ষেই অনিশ্চিত। যদি অন্য পুরুষকে মনোনিত করিতাম, তবে তিনিই যে দীর্ঘায়ু হইতেন তাহা কে বলিতে পারে? যাহাই হউক, বৈধব্যের ভয়ে —অধর্ম্ম কখনো করিতে পারিব না। আপনারা এই বিবাহেই অনুমোদন করুন।"

নারদ কহিলেন, "মহারাজ, তোমার এই কন্যা নিতান্ত স্থিরবুদ্ধি ও ধর্ম্মশীলা। ধর্ম্মপথ হইতে ইহাকে বিচলিত করিবার বৃথা চেষ্টা করিও না। সত্যবানের হস্তেই ইহাকে সম্প্রদান কর।"

অগত্যা অশ্বপতি স্বীকৃত হইলেন। তপোবনে দ্যুমৎসেনের কুটীরে উপস্থিত হইয়া, সত্যবানের সঙ্গে রাজা কন্যার বিবাহ দিলেন।

(২)

সাবিত্রী এখন আর রাজকন্যা নহেন,—কুটীরবাসী দরিদ্রের বধূ। রাজকন্যার বেশভূষা আর তাঁহাকে সাজে না। পিতা গৃহে ফিরিয়া গেলে, সাবিত্রী পিতৃদত্ত বহুমূল্য বসন ভূষণ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, বনবাসিনী তপস্বিনীর দীনবেশ ধারণ করিলেন। গৃহকর্ম্মে এবং শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামীর সেবায় অল্পদিনেই সাবিত্রী তপোবনোবাসী সকলেরই অতিশয় স্নেহ ও শ্রদ্ধার পাত্রী হইলেন। তাঁহার কার্য্য এবং ব্যবহারে, রাজগৃহের ঐশ্বর্য্য ও বিলাসে প্রতিপালিতা রাজকন্যা বলিয়া কেহ তাঁহাকে মনে করিতে পারিত না। সকলেরই মনে হইত, যেন, দরিদ্রগৃহে পালিতা লক্ষ্মীটি, দরিদ্র কুটীরবাসীর বধূ হইয়া আসিয়াছে।

ক্রমে একবৎসর পূর্ণ হইয়া আসিল। কম্পিত হৃদয়ে সাবিত্রী সেই ভীষণ কাল-দিবসের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু প্রাণের সমস্ত উদ্বেগ—সমস্ত যন্ত্রণা তিনি প্রাণেই চাপিয়া রাখিলেন। শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী, কাহাকেও কিছু বলিলেন না। গম্ভীর প্রশান্ত মুখচ্ছবি,—কিন্তু সাবিত্রীর মনের মধ্যে কি-যে আগ্নেয়গিরির ক্রিয়া চলিতেছিল,—তাহা বর্ণনার বিষয় নহে। পতিপ্রাণা রমণীমাত্রেই সাবিত্রীর সে সময়ের মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিবেন।

আর চারিদিন মাত্র বাকি আছে। সাবিত্রী উপবাসসহ কঠোর ত্রিরাত ব্রত আরম্ভ করিলেন।

বালিকা বধূকে এই কঠোর ব্রতের উপবাসে ক্লিষ্ট দেখিয়া, শ্বশুর শাশুড়ী ব্রতভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে আহার করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন। সাবিত্রী কহিলেন,—"আপনাদের আশীর্ব্বাদে এ কঠোর ব্রত আমি সম্পন্ন করিতে পারিব। ক্লেশ ভিন্ন ধর্ম্মসাধন হয় না। প্রাণপণ অধ্যবসায়ে আমি এ ক্লেশ সহ্য করিব। আপনারা ধার্ম্মিক হইয়া কেন আমাকে এই ব্রতভঙ্গের অধর্ম্মে উপদেশ দিতেছেন?"

উপবাসে ও দেব-আরাধনায় তিন দিন গত হইল। চতুর্থ দিন,—সেই কাল-দিন,—যে দিন সাবিত্রীকে চিরবৈধব্যের কঠোরতায় ফেলিয়া সত্যবান্ ইহসংসার ত্যাগ করিয়া যাইবেন, যে দিন বালিকা বয়সে সাবিত্রীর নারীজীবন ব্যর্থ হইবে,—যে দিন সত্যবানের প্রেমে — দীন কুটীরে পৃথিবীর সাম্রাজ্য ভোগের সুখ হইতে—চিরদিনের মত তিনি বঞ্চিত হইবেন,—সেই দিন আসিল। ধর্ম্মতেজে তেজস্বিনী সাবিত্রী, হৃদয়ের সমস্ত শক্তি—সমস্ত তেজ, হৃদয়ে কেন্দ্রীভূত করিয়া, যেন বিধাতার অলঙ্ঘনীয় নিয়তিকে পর্য্যন্ত পরাভূত করিবার জন্য, দৃঢ়সঙ্কল্পে দণ্ডায়মান হইলেন।

প্রত্যূষে দেবগণের উদ্দেশে প্রদীপ্ত যজ্ঞানলে হোম করিয়া, সাবিত্রী তাহাতে আহুতি দিলেন। পরে বনবাসী সমস্ত ব্রাহ্মণকে এবং শ্বশুর ও শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। সকলেই তাঁহাকে "অবৈধব্য হউক" এক-বাক্যে এই আশীর্ব্বাদ করিলেন। অবনতমস্তকে, প্রাণের

একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত এই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া, সাবিত্রী দৃঢ়চিত্তে সেই কাল-মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ব্রত সাঙ্গ হইল বলিয়া শাশুড়ী তাঁহাকে আহার করিতে বলিয়াছেন; সাবিত্রী কহিলেন,—"মা, এখন নয়; এখন আহারে রুচি নাই। সূর্য্যাস্তের পর আহার করিব।"

অপরাহ্ণে সত্যবান্ পিতামাতার জন্য যজ্ঞের কাষ্ঠ ও আহার্য্য ফলমূল সংগ্রহের জন্য কুঠার লইয়া আশ্রমের নিকটবর্ত্তী গভীর বনে যাইতে উদ্যত হইলেন। সাবিত্রীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। বুঝি কাল-মুহূর্ত্ত আসিল,—বিধির নিয়তি পূর্ণ হইতে চলিল,—গভীর অরণ্যে একা সত্যবান্ তবে সাবিত্রকে ফাঁকি দিয়া জন্মের মত চলিয়া যাইবেন! সাবিত্রী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। সত্যবানের সঙ্গে বনগমনে প্রস্তুত হইলেন। সত্যবান্ কহিলেন, —"তুমি তিন দিন না খাইয়া আছ, এখন কি বনে বনে আমার সঙ্গে ঘুরিতে পারিবে?"

সাবিত্রী কহিলেন,—"না খাইয়া আমার কোনই কষ্ট হয় নাই। আমি পারিব। তোমার সঙ্গে বন দেখিতে যাইব; আমাকে বারণ করিও না।"

সত্যবান্ কহিলেন,—"তবে পিতামাতার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।"

অনাহারক্লিষ্টা সাবিত্রীকে এমন সময়ে বনে যাইতে উদ্যত দেখিয়া, তাঁহারা আপত্তি করিলেন। তাঁহাকে কুটীরে থাকিয়া আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু, এমন সময়ে আহারে

কা'র রুচি থাকে? সাবিত্রীর অনাহারে ক্লেশ নাই, অন্য চিন্তা নাই, একমাত্র স্বামীর আসন্ন মৃত্যুর চিন্তাতেই সাবিত্রী অভিভূতা। সাবিত্রী অনুনয় করিয়া শ্বশুর শাশুড়ীর অনুমতি লইয়া, স্বামীর সঙ্গে গেলেন। পাছে সত্যবান্ কিছু বুঝিতে পারেন, মৃত্যু বা কোনরূপ অমঙ্গল আসন্ন জানিয়া পাছে তাঁহার চিত্ত অবসন্ন হয়, এই ভয়ে, প্রাণের নিদারুণ যন্ত্রণা সত্ত্বেও, হাসিতে হাসিতে সাবিত্রী, বনের নানাবিধ শোভা দেখাইতে দেখাইতে পতির সঙ্গে চলিলেন।

(৩)

কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সহসা সত্যবানের সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িল। নিদারুণ শিরঃপীড়ায় তিনি কাতর হইলেন। সাবিত্রী বুঝিলেন, তাঁহার সর্ব্বনাশের সময় উপস্থিত। কিন্তু তিনি কাঁদিয়া সত্যবান্‌কে অস্থির করিলেন না। স্থিরচিত্তে, ধীরে ধীরে অবসন্ন সত্যবানের মস্তক কোলে রাখিয়া, বৃক্ষমূলে বসিলেন।

সেই কাল-সন্ধ্যায়—গভীর অরণ্যে একাকিনী সাবিত্রী—মুমূর্ষ পতির মস্তক কোলে রাখিয়া নীরবে শেষ-মুহূর্ত্তের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দেখিতে দেখিতে সত্যবান্ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সহসা শ্যামবর্ণ, রক্তবসন, উজ্জ্বল মুকুট-শোভিত এক দিব্য পুরুষ কালদণ্ড হস্তে সেইখানে আবির্ভূত হইলেন! স্বামীর মস্তক

যত্নে মাটিতে রাখিয়া, ধীরভাবে উঠিয়া সাবিত্রী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—"দেব, আপনি কে? কেন এখানে আসিয়াছেন?"

দিব্যপুরুষ কহিলেন,—"আমি যম, তোমার স্বামীর কালপূর্ণ হইয়াছে; তাই তাহাকে নিতে আসিয়াছি।"

সাবিত্রী কথা কহিলেন না। যমরাজ তখন সত্যবানের দেহ হইতে তাঁহার সূক্ষ্ম-প্রাণ-শরীর বাহির করিয়া লইয়া স্বর্গের দিকে চলিলেন।

সাবিত্রী নীরবে যমরাজের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে লাগিলেন। সাবিত্রীকে সঙ্গে আসিতে দেখিয়া, যম কহিলেন,—"মা, তুমি কেন আমার সঙ্গে আসিতেছ? ফিরিয়া যাও।—বৃক্ষতলে তোমার স্বামীর মৃতদেহ পড়িয়া আছে। তাহার যথাবিধি সৎকার কর।"

সাবিত্রী কহিলেন,—"দেব, আমার স্বামী যেখানে যান, আমি সেইখানেই যাইব। স্বামীর সঙ্গই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম,—স্বামীর সঙ্গই একমাত্র সুখ। ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া কেন আপনি আমাকে স্বামীর সঙ্গত্যাগ করিতে বলিতেছেন? তপস্যা, গুরুসেবা, পতিভক্তি, ব্রত ও আপনার অনুগ্রহবলেই আমি আপনার দর্শন পাইয়াছি এবং সঙ্গে যাইবার অধিকারিণী হইয়াছি। কেন তবে আমাকে নিষেধ করেন? দেব, আপনি জানেন, গৃহধর্ম্মই স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম।—গৃহধর্ম্মের দেবতা স্বামীতে বঞ্চিত হইয়া কিপ্রকারে সে ধর্ম্ম পালন করিব? তাই আপনার সঙ্গেই যাইতেছি।"

যম কহিলেন,—"মা, তোমার ধর্ম্মপরায়ণতায়, এবং এই সুন্দর যুক্তিযুক্ত কথায় আমি বড় প্রীত হইয়াছি। সত্যবানের জীবন ভিন্ন যে কোন বর প্রার্থনা কর, তাহাই তোমাকে দিব।"

সাবিত্রী কহিলেন,—"আমার শ্বশুর অন্ধ ও রাজ্যচ্যুত হইয়া বনে বাস করিতেছেন। তিনি চক্ষুলাভ করুন এবং অগ্নি ও সূর্য্যের মত বলশালী হউন।"

যম 'তথাস্তু' বলিয়া, চলিলেন। সাবিত্রীও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

বর দিবার পরেও সাবিত্রীকে সঙ্গে আসিতে দেখিয়া যম বলিলেন,—"মা, তোমাকে ইচ্ছানুরূপ বর দিলাম, আবার কেন আসিতেছ? পথশ্রান্তিতে তুমি ক্লান্ত হইয়াছ।—অনর্থক কেন শ্রান্তিবৃদ্ধি করিবে?"

সাবিত্রী কহিলেন,—"ক্লান্তি কি প্রভু? আমি যে স্বামীর সঙ্গে আছি। আমার কিছুই পরিশ্রম বোধ হইতেছে না। স্বামীই স্ত্রীলোকের দেবতা—একমাত্র গতি, সুতরাং স্বামী যেখানে যাইবেন আমি সেইখানেই যাইব। তা'রপর,—দেবতাদর্শন, সাধু-সমাগম, সচরাচর লোকের ভাগ্যে ঘটে না।—আপনার দর্শন ও সঙ্গ যখন পাইয়াছি, তখন তাহা কেন ছাড়িব?"

যম বলিলেন,—"মা! তুমি অতি মিষ্টভাষিণী, তোমার কথায় বড় প্রীত হইলাম। সত্যবানের জীবন ভিন্ন আর এক বর প্রার্থনা কর।"

সাবিত্রী কহিলেন,—"আমার শ্বশুর তাঁহার হৃতরাজ্য আবার ফিরিয়া পা'ন, এই বর প্রার্থনা করি।"

যম কহিলেন,—"আচ্ছা তাহাই হইবে, তবে এখন তুমি ফিরিয়া যাও।"

সাবিত্রী কহিলেন,—"দেব, জগতের সমুদায় প্রাণীই আপনার নিয়মে শাসিত হইতেছে, তাই আপনি সকল দেবের প্রধান যম। দেবতারা ভক্তবৎসল, চিরদিনই তাঁহারা ভক্তকে, স্নেহে, অনুগ্রহে ও দানে তুষ্ট করিয়া থাকেন। ইহাই দেবতার ধর্ম্ম। ভক্তিতে আপনার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিব, আপনার দয়ায় কৃতার্থ হইব, তাই আপনার সঙ্গে যাইতেছি।"

যম বলিলেন,—"আহা, তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি যেমন শীতল জলে তৃপ্ত হয়, আমিও তোমার কথায় সেইরূপ তৃপ্ত হইলাম।—"মা, সত্যবানের জীবন ছাড়া তুমি যে কোন বর প্রার্থনা কর।"

সাবিত্রী এবার পুত্রহীন পিতার একশত পুত্র বর প্রার্থনা করিলেন।—বর দিয়া যম নিজ পথে চলিতে লাগিলেন।

সাবিত্রীও সঙ্গে চলিলেন।

যম কহিলেন,—"আবার কেন মা আসিতেছ? যে বর চাহিলে, তাহাই দিলাম। এখন গৃহে যাও।—তুমি অনেক দূর আসিয়াছ।"

সাবিত্রী কহিলেন,—"স্বামীর সঙ্গে রহিয়াছি এই আমার গৃহ। দূর কি প্রভু? তা'রপর দেব, তুমি ধর্ম্মরাজ। লোকের নিজের উপর যে বিশ্বাস—যে নির্ভর থাকে, ধার্ম্মিকে উপর তাহার অপেক্ষা বেসি বিশ্বাস—বেসি নির্ভর থাকে। স্বয়ং ধর্ম্মের অধিপতি তুমি,—আজ তোমার আশ্রয় পাইয়া কেন আমি তাহা ত্যাগ করিব?"

যম যা'র-পর-নাই সন্তুষ্ট হইয়া সাবিত্রীকে সত্যবানের প্রাণ ভিন্ন আর এক বর চাহিতে কহিলেন। সাবিত্রী কহিলেন,—"দেব, যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর দিন্, যেন সত্যবানের ঔরসে প্রত্যেক পঞ্চম বৎসরে একটি করিয়া আমার এক শত পুত্র হয়।"

যম "তথাস্তু" বলিয়া চলিলেন।

কিন্তু সাবিত্রী সঙ্গ ছাড়িলেন না। যম নিরুপায় হইয়া কহিলেন,—"তুমি যাহা যাহা চাহিলে সবই দিলাম। তবে কেন আমার সঙ্গ ছাড়িতেছ না? তুমি আর কি চাও, বল।"

যম প্রত্যেক বারেই "সত্যবানের জীবন ছাড়া অন্য বর প্রার্থনা কর" ইহাই বলিয়াছেন। সাবিত্রীর ক্রমাগত পশ্চাৎ-গমনে তাঁহার কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়ায় এবার আর সে কথার উল্লেখ না করিয়াই সাবিত্রীকে বর দিতে চাহিলেন। সাবিত্রীও এই সুযোগে বলিলেন,—"আমি সত্যবানের জীবন প্রার্থনা করি। আপনি ইহার পূর্ব্বে সত্যবানের ঔরসে আমার একশত পুত্র বর প্রদান করিয়াছেন। এখন সত্যবান্ পুনর্জ্জীবিত না হইলে আপনার সেই বরদান নিষ্ফল হইবে। তাই প্রার্থনা করি—এই শেষ বরে সত্যবানের জীবনদান করিয়া আপনার সত্যপালন করুন,—যে বর দিয়াছেন, তাহা সফল করুন।—"

যম তখন নিরুপায় হইলেন। আর কি করিবেন? সত্যবানের প্রাণ-শরীর সাবিত্রীকে ফিরাইয়া দিয়া যম কহিলেন,—"মা, তোমার জীবন সার্থক। তোমার পাতিব্রত্যধর্ম্ম সার্থক।

জগতে যাহা কখনো কেহ পারে নাই,—সতীত্বধর্ম্মবলে তুমি তাহাই করিলে। আদর্শ সতী বলিয়া জগতে চিরদিন তোমার প্রসিদ্ধি থাকিবে।”

এই বলিয়া যমরাজ প্রস্থান করিলেন। সত্যবানের সূক্ষ্ম-প্রাণ-শরীর লইয়া সাবিত্রী সেই বৃক্ষমূলে ফিরিয়া সত্যবান্‌কে পুনর্জ্জীবিত করিলেন।

সত্যবান্ সুস্থ হইলে, উভয়ে কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন। সমস্ত ঘটনা শুনিয়া,—যমের বরে দ্যুমৎসেন পূর্ব্বেই চক্ষু পাইয়াছেন,—চক্ষুপ্রাপ্ত দ্যুমৎসেন, দ্যুমৎসেনের মহিষী এবং বনবাসী মুনিঋষিগণ সকলে সাবিত্রীকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। পরদিন সংবাদ আসিল,—দ্যুমৎসেনের মন্ত্রী শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য উদ্ধার করিয়াছেন। পুত্র ও পুত্রবধূসহ সস্ত্রীক দ্যুমৎসেন নিজ রাজ্যে গিয়া আনন্দ উৎসবে রাজ্য শাসন আরম্ভ করিলেন।

দময়ন্তী।

(১)

প্রাচীন কালে যে সব আর্য্যনারী স্বামীর দুঃখ ও বিপদের সঙ্গিনী হইয়াও আপনাদিগকে সৌভাগ্যবতী মনে করিতেন, স্বামীর সঙ্গে ভয়সঙ্কুল অরণ্যের পর্ণকুটীরে বাসও নিরাপদ রাজগৃহের বিলাস-সম্ভোগ অপেক্ষা অধিক সুখের মনে করিতেন, অতুল সতীত্বগৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া যাঁহারা ভারতকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, দময়ন্তী তাঁহাদেরই মধ্যে একজন প্রধানা।

দময়ন্তী বিদর্ভরাজ ভীমের কন্যা। রূপে গুণে তাঁহার মত রত্নস্বরূপা রাজকন্যা আর কেহই তখন ভারতে ছিলেন না। ওদিকে, রূপ গুণ বিদ্যা ও শৌর্য্য বীর্য্যে নিষধরাজ নলকেই লোকে তখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া মনে করিত। লোক-মুখে উভয়ের অতুলনীয় রূপ গুণের কথা শুনিয়া উভয়েই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন।

দময়ন্তীর চিন্তায় অধীর হইয়া একদিন নলরাজা নিজের প্রমোদ-উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময় তিনি কতকগুলি স্বর্ণপক্ষবিশিষ্ট সুন্দর হংস দেখিতে পাইলেন। নল ইহাদের একটিকে ধরিলেন। ধরিলে, মানুষের মত কথা কহিয়া সেই হংস বলিল,—"মহারাজ, আমাকে মুক্ত করুন। আমি

দময়ন্তীর নিকট আপনার রূপ-গুণের কথা এমন ভাবে বলিব, যে, তিনি আপনাকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

নল হাঁসটিকে ছাড়িয়া দিলেন। হাঁসগুলি তখনই উড়িয়া বিদর্ভ দেশের রাজ-অন্তপুরের প্রমোদ উদ্যানে গিয়া পড়িল।

দময়ন্তীও তখন সখীগণের সঙ্গে উদ্যানে বেড়াইতেছিলেন। অমন সুন্দর হাঁস দেখিয়া দময়ন্তী ও তাঁহার সখীরা উহাদিগে ধরিতে গেলেন। হাঁসগুলি এদিক ওদিক ছুটিল। সখীরাও সকলে এক একজনে এক একটা হাঁসের পশ্চাতে ছুটিলেন। দময়ন্তী নিজে যে হাঁসটিকে ধরিতে গেলেন, সে ছুটিতে ছুটিতে নির্জ্জন স্থানে গিয়া দময়ন্তীর নিকট নলের রূপ গুণ বর্ণনা করিয়া কহিল,—"রাজপুত্রি! জন্ম, জীবন এবং তোমার রূপ-যৌবন যদি সার্থক করিতে চাও, তবে নলকে বরণ কর। পুরুষের মধ্যে যেমন নল, স্ত্রীলোকের মধ্যে তেমনি তুমি। তোমাদের এই মিলনের মত মিলন আর হইতে পারে না।

দময়ন্তী পূর্ব্বেই নলের রূপ গুণের কথা শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, এখন হংসমুখে এই কথা শুনিয়া নলকে মনে মনে পতি বলিয়া বরণ করিলেন।

(২)

বিদর্ভরাজ, দময়ন্তীর স্বয়ম্বর ঘোষণা করিয়াছেন। নানা দেশের রাজারা বিদর্ভনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিষধ-রাজ নলও আসিলেন। দময়ন্তীর নারীদুর্লভ রূপের কথা শুনিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার আশায় ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম এই

চারিজন দেবতাও স্বয়ম্বরে গেলেন। দেবতারা মানবীর স্বয়ম্বরে আসিয়াছেন, এখন দময়ন্তী যদি তাঁহাদের কাহাকেও বরণ না করেন, তবে লজ্জা ও অপমানের একশেষ হইবে, তাই তাঁহারা দময়ন্তীর নিকটে নিজেদের আকাঙ্ক্ষা জানাইয়া কোন দূত পাঠাইবেন, স্থির করিলেন। সকল গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেখিয়া, নলকে তাঁহারা কহিলেন,—"নল, তুমি আমাদের কোন দৌত্য গ্রহণ কর।" নল "যে আজ্ঞা" বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন দেবতারা কহিলেন,—"তুমি অবিলম্বে দময়ন্তীর নিকট গিয়া আমাদের পরিচয় দিয়া তাঁহাকে অনুরোধ কর যে তিনি আমাদের একজনকে বরণ করুন।"

নল কহিলেন,—"দেবগণ, আমিও আপনাদের মত দময়ন্তী-লাভের আশায় এখানে আসিয়াছি। এ দৌত্য আমি কি প্রকারে গ্রহণ করিব? নিজে দময়ন্তীর প্রার্থী হইয়া কি প্রকারে তাহাকে বলিব, তুমি অন্যকে বরণ কর? অতএব আমাকে মার্জ্জনা করুন।"

দেবতারা কহিলেন,—"তুমি পূর্ব্বে আমাদের দৌত্য গ্রহণ করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছ। এখন কথা দিয়া কথা রাখিবে না?"

নল আর দ্বিরুক্তি না করিয়া দময়ন্তীর নিকট যাইতে প্রস্তুত হইলেন। দেবগণের প্রসাদে তিনি অন্যের অদৃশ্য হইয়া দময়ন্তীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। সমস্ত ঘটনা বলিয়া তিনি দেবগণের একজনকে বরণ করিবার জন্য দময়ন্তীকে অনুরোধ করিলেন।

দময়ন্তী কহিলেন,—"দেবগণ আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আমি আপনাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি। স্বয়ম্বর-সভায় আপনার গলেই বরমাল্য দিব।"

নল কহিলেন,—"আমি যে দৌত্য লইয়া আসিয়াছি, তাহাতে এই উত্তর লইয়া কি প্রকারে দেবগণের নিকট যাইব? তাঁহারা কি মনে করিবেন? তাঁহারা এজন্য আমাকেই অপরাধী করিবেন।"

দময়ন্তী কহিলেন,—"আমার বরমাল্য আমি যাঁহাকে ইচ্ছা দিব। ইহাতে আপনার অপরাধ কি? আমি গোপনে আপনাকে মাল্য দান করিতেছি না, সভায় সকলের সমক্ষে করিব। দেবগণও যেন স্বয়ম্বরে উপস্থিত থাকেন। তাঁহাদের সাক্ষাতেই আমি নিজ ইচ্ছামত আপনাকে বরণ করিব। আপনাকে তাঁহারা দোষী বলিয়া মনে করিতে পারিবেন না।"

নল দেবগণের নিকট গিয়া সমস্ত কথা নিবেদন করিলেন। দময়ন্তীর অবলেহায় দেবগণ রুষ্ট হইয়া স্বয়ম্বর সভায় তাঁহারাও নলের রূপ ধরিয়া বসিয়া রহিলেন।

যথাসময়ে বরমাল্য লইয়া দময়ন্তী স্বয়ম্বর সভায় আসিলেন। উপস্থিত রাজগণের নাম ও গুণকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কিন্তু দময়ন্তীর সে দিকে কাণ নাই। তিনি নলকে বরণ করিবেন আগেই স্থির করিয়াছেন, সুতরাং, অন্য রাজগণের গুণকীর্ত্তন-শ্রবণে তাঁহার কোনই প্রয়োজন নাই। নলের অনুসন্ধান করিতে করিতে তিনি দেখিলেন যে, সভায় একই রকম চারিজন

নল উপস্থিত। দময়ন্তী বুঝিলেন, তাঁহাকে প্রতারিত করিবার জন্য ইহা রুষ্ট দেবগণের মায়া।

কোনও মতে প্রকৃত নলকে চিনিতে না পারিয়া তিনি দেবগণের দয়া-প্রার্থিনী হইয়া মনে মনে তাঁহাদিগকে ডাকিতে লাগিলেন,—"দেবগণ! আমি পূর্ব্বেই নলকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি। আপনারা দেবতা, শরণাগত মানবের ধর্ম্মরক্ষাই আপনাদের কর্ত্তব্য। কেন ছলে আমাকে অধর্ম্মে পরিচালিত করিতেছেন? অবলার প্রতি সদয় হউন। নলকে আমাকে চিনাইয়া দিন। আপনারা নিজ নিজ চিহ্ন ধারণ করুন,—আমি আমার মনোনীত স্বামী চিনিয়া তাঁহাকে বরণ করিব। সতীর সতীত্বধর্ম্ম রক্ষা হউক।"

শরণাপন্ন দময়ন্তীর প্রার্থনায় দেবগণ তুষ্ট হইয়া নিজ নিজ চিহ্ন ধারণ করিলেন। দময়ন্তী নলকে বরণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। দেবগণও নলের উপর সন্তুষ্ট হইয়া—তিনি ইচ্ছা করিলেই সর্ব্বত্র অগ্নি জ্বলিবে ও জল আসিবে এবং যে-ভাবে-ইচ্ছা রাঁধিলেও তাহা অতি সুস্বাদু হইবে, ইত্যাদি নানাবিধ বর তাঁহাকে প্রদান করিয়া অমরলোকে প্রস্থান করিলেন।

পথে দেবগণের সঙ্গে কলি ও দ্বাপরের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারাও দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে আসিতেছিলেন। দময়ন্তী দেবগণকে উপেক্ষা করিয়া মানব নলকে বরণ করিয়াছেন শুনিয়া, দুষ্ট দেবতা কলির অত্যন্ত ক্রোধ হইল। প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া, কলি দ্বাপরকে কহিলেন,—"যেরূপেই হউক আমি

নলকে আশ্রয় করিয়া পাশা খেলায় তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া দময়ন্তীর সহিত বিচ্ছিন্ন করিব। তুমি পাশার মধ্যে থাকিয়া আমার সাহায্য করিবে।"

এই দুষ্ট পরামর্শ করিয়া উভয়ে অদৃশ্যভাবে নলের রাজ্যে গিয়া রহিলেন।

(৩)

নল দময়ন্তীকে লইয়া পরম সুখে রাজ্যভোগ করিতেছেন। ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনা নামে তাঁহাদের একটি পুত্র ও একটি কন্যা হইল। কিন্তু কলির চক্রান্তে বেসিদিন তাঁহাদিগকে এ সুখ ভোগ করিতে হইল না।

এক দিন ভ্রমবশতঃ অশুচি অবস্থায় নল সন্ধ্যা উপাসনা করিয়াছিলেন। —এই সূত্রে দুষ্ট কলি তাঁহার শরীর আশ্রয় করিল। পুষ্কর নামে নলের এক দুষ্টবুদ্ধি হীনচরিত্র ভ্রাতা ছিল। কলি তাহার নিকট গিয়া কহিল,— "তুমি নলের সঙ্গে পাশা খেল। আমি নলকে আশ্রয় করিয়া তাহার বুদ্ধি বিকৃত করিয়া দিব। দ্বাপর পাশার মধ্যে থাকিয়া তোমার সাহায্য করিবে। পাশা খেলায় নলকে হারাইয়া তুমি নলের রাজ্য-ধনের অধিকারী হও।"

পুষ্কর রাজ্যলোভে ভ্রাতার সর্ব্বনাশ করিতে প্রস্তুত হইয়া নলের নিকট গিয়া তাঁহাকে পাশা খেলিতে আহ্বান করিল। কলি-আশ্রিত নল, দ্বিরুক্তি না করিয়া খেলিতে বসিলেন।

ধনের পর ধন পণ রাখিয়া নল খেলায় হারিতে লাগিলেন। যতই হারেন, খেলার মত্ততা ততই তাঁহার বাড়িতে লাগিল। দময়ন্তী দেখিলেন, সর্ব্বনাশ উপস্থিত। তিনি নিজে এবং মন্ত্রী ও রাজ্যের অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে ডাকাইয়া তাঁহাদের দ্বারা, নলকে বার বার খেলায় নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু নল কাহারও কথায় কর্ণপাতও করিলেন না।

দময়ন্তী বুঝিলেন, নলকে অবিলম্বে ভিখারী হইয়া গৃহের বাহির হইতে হইবে। তিনি নিজে স্বামীর দুঃখের ভাগিনী হইতে প্রস্তুত। কিন্তু শিশু পুত্র-কন্যার দশা কি হইবে? অবিলম্বে সারথিকে ডাকিয়া তিনি পুত্রকন্যাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন।

এদিকে নল রাজ্য পর্য্যন্ত হারিয়াছেন। পণ রাখিবার তাঁহার আর কিছুই নাই। পুষ্কর বিদ্রূপ করিয়া কহিল,— "এখন দময়ন্তীকে পণ রাখ।" ক্রোধে ও অপমানে নলের হৃদয় তখন প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া নিজের বহুমূল্য রাজবসন ও রাজভূষণ ত্যাগ করিয়া, এক বসনে রাজপুরী ত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইলেন। দময়ন্তীও নিজের বসন ভূষণ ত্যাগ করিয়া এক বসনে নলের অনুগামিনী হইলেন। পুষ্কর, রাজ্যমধ্যে প্রচার করিল যে, যে কেহ নলের কোনরূপ সাহায্য করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। আশ্রয়হীন হইয়া, উপবাসে ও তৃষ্ণায় কাতর নল, পত্নীসহ নগরের বাহিরে এক বনে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

(৪)

বনের মধ্যে একদিন তাঁহারা ক্ষুধায় অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। কোথাও কিছু আহার মিলিল না।

সহসা নল কতলগুলি সুন্দর পাখী দেখিতে পাইলেন।

পাখীগুলিকে ধরিবার জন্য নিজের একমাত্র পরিধেয় বসন উন্মোচন করিয়া, নল, পাখীগুলির উপরে উহা ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। বসনসহ পাখীগুলি আকাশে উড়িয়া গেল। যাইবার সময় পাখীরা কহিল,—"নল! আমরা সেই পাশা, তোমার আরও দুর্গতি করিবার জন্য বসন পর্য্যন্ত হরণ করিলাম।"

দময়ন্তী নিজের অর্দ্ধ বসনে নলের লজ্জা নিবারণ করিলেন।

নলের ব্যথিত হৃদয় দুঃখে ভরিয়া উঠিল। এ যন্ত্রণা তাঁহার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। বিশেষ তাঁহার প্রাণস্বরূপা দময়ন্তী তাঁহার সঙ্গে এই কষ্ট সহিতেছেন। নিজে একা হইলে, যে-কোনও কষ্ট সহিতে পারিতেন। কিন্তু দময়ন্তীর এই বনভ্রমণ, এই অনাহার-ক্লেশের চিন্তা তাঁহার প্রাণে দারুণ ব্যথা দিতে লাগিল। দময়ন্তী যদি তাঁহার পিতৃগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, তবে তাঁহার যন্ত্রণার অনেক লাঘব হইত। কিন্তু দময়ন্তী সহজে তাঁহাকে ছাড়িয়া পিতৃগৃহে যাইবেন না।

নল চিন্তা করিতে লাগিলেন,—যদি তিনি কোন সুযোগে দময়ন্তীকে ফেলিয়া পলাইয়া যাইতে পারেন, তবে দময়ন্তী অগত্যা পিতৃগৃহে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইবেন। এই চিন্তা করিয়া, নল দময়ন্তীকে বিদর্ভদেশে যাইবার পথ দেখাইতে লাগিলেন।

দময়ন্তীর বড় ভয় হইল। তিনি কহিলেন,—"কেন তুমি আমাকে বিদর্ভে যাইবার পথ দেখাইতেছ? এই বনে কি একা আমাকে ফেলিয়া তুমি পলাইয়া যাইবে?" নল দময়ন্তীকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, তাঁহার সেরূপ কোন অভিপ্রায় নাই। কিন্তু দময়ন্তীর মন প্রবোধ মানিল না; তিনি কহিলেন,—"কেন তবে আমাকে বিদর্ভের পথ দেখাইতেছ? তোমার বুদ্ধি স্থির নাই, তোমার মনে কি আছে জানি না। আমায় ফেলিয়া যাইও না। তোমাকে ছাড়িয়া পিতৃগৃহে আমি কখনো যাইব না। তুমি এত কষ্ট পাইতেছ, আমি কাছে থাকিয়া তোমার শুশ্রূষা করিব। একা তোমার আরো কষ্ট হইবে। তোমার দুঃখের ভাগিনী হইয়া তোমার কাছে আছি, তোমার সেবা করিতেছি। ইহাই আমি পরম সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করি। এ সৌভাগ্যে আমাকে বঞ্চিত করিও না। আর যদি বিদর্ভদেশে যাওয়া তোমার ইচ্ছা হয়, তবে চল, দু'জনেই যাই। পিতা তোমাকে পরম সমাদরে রাখিবেন।"

নল বলিলেন,—"একদিন রাজগৌরবে তোমার পিতৃগৃহে গিয়াছি। আমার গৌরবে তুমিও সেখানে গৌরবিনী হইয়াছ। আজ এই দীন-ভিখারী অবস্থায় সেখানে গিয়া তোমার মুখ ছোট করিব না। বিশেষ, বিপন্ন অবস্থায় বান্ধবের শরণাপন্ন হওয়া যে-কোন পুরুষের পক্ষেই বড়ই অবমানন্যকর।"

দময়ন্তী আর কিছু কহিলেন না। এক বসনে আবৃত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে দুইজনে ক্লান্ত হইয়া এক বৃক্ষতলে বসিলেন।

অতি ক্লান্তিতে বৃক্ষের তলে শয়ন করিয়াই দময়ন্তী নিদ্রিত হইলেন। চিন্তাক্লিষ্ট নলের নিদ্রা হইল না। তিনি দময়ন্তীর পাশে বসিয়া রহিলেন।

(৫)

দময়ন্তীকে তিনি পরিত্যাগ করিয়া গেলে, যে কোন রূপেই হউক দময়ন্তী পিতৃগৃহে গিয়া আশ্রয় লইবেন।—নলের হৃদয়ে এখন এই মাত্র চিন্তা। নল দেখিলেন, দময়ন্তী গভীর নিদ্রায়। তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবার এই-ই সুযোগ। কিন্তু, দময়ন্তীর বস্ত্রার্দ্ধে তিনি আবৃত, কি প্রকারে যাইবেন? সহসা দেখিলেন, নিকটে একখানা অসি পড়িয়া আছে। সেই অসিদ্বারা নল বসনের অর্দ্ধেক ছিন্ন করিয়া, তাহাই পরিয়া, সেই বনে একা দময়ন্তীকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন!

নিদ্রা ভঙ্গ হইলে দময়ন্তী দেখিলেন, নল কাছে নাই!—তাঁহার বসনের অর্দ্ধেক কাটা! বুঝিলেন, নল সত্য-সত্যই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন! উন্মাদিনীর ন্যায় দময়ন্তী কাঁদিয়া কাঁদিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া নলকে ডাকিয়া ডাকিয়া সেই নিবিড় বনে ঘুরিতে লাগিলেন।

বনের বৃক্ষলতা, পাহাড়, নদী, সরোবর, জীবজন্তু, দময়ন্তী যা'কে দেখিলেন, সকলকেই নলের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।—"বল বৃক্ষ, বল লতা, তুমি আমার নলকে দেখিয়াছ? বল নদী, শ্রান্ত নল কি এখানে জল খাইতে আসিয়াছিলেন? বল, তাঁ'কে

কোন্‌দিকে যাইতে দেখিয়াছ? তুমি অনেক দূর হইতে আসিয়াছ, নলকে কি সেদিকে দেখিয়াছ? তুমি যেদিক যাইতেছ, নলকে দেখিলে আমার কথা বলিও! বলিও, আমি একা বনে বনে তাঁ'র অন্বেষণে ঘুরিতেছি। বলিও, তাঁ'কে না পাইলে এই বনে আমি মরিব! বল পর্ব্বত, তুমি তো অনেক উচুতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছ,—বল, তুমি আমায় নলকে দেখিয়াছ? বল, তিনি কোন্ পথে যাইতেছেন? আমি সেই দিকে যাইব। তাঁ'কে ডাকিয়া বল, আমি তাঁ'র কাছেই যাইতেছি। পাখী, তুমি কোন্ দিক হইতে উড়িয়া আসিলে? সে দিকে কি আমার নলকে দেখিলে? হরিণ, তোমার বড় বড় চোক দু'টিতে কি আমার নলকে দেখ নাই? নল!—মহারাজ! প্রাণেশ্বর! তুমি কোথায় গেলে? একা এ বনে আমায় ফেলিয়া, কোন্ প্রাণে চলিয়া গেলে? এই বনে কে আমায় রক্ষা করিবে? আহা!—পথশ্রান্তিতে তুমি যেন কত ক্লান্ত হইয়াছ! কে তোমার কাছে বসিয়া ক্লান্তিদূর করিবে? আহা, তোমার বুঝি তৃষ্ণা পাইয়াছে! কে তোমাকে নদীর জল, ঝরণার জল, আনিয়া দিবে? তোমার দাসী তো সঙ্গে নাই, একা এ কষ্ট তুমি কেমন করিয়া সহিবে।"

কাঁদিতে কাঁদিতে পতিশোকাকুলা উন্মাদিনী বনমধ্যে ধাবিত হইলেন। সহসা এক বৃহৎ অজগর সর্প তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। দময়ন্তী কহিলেন,—"কোথায় নল, কোথায় প্রাণেশ্বর! আজ তোমার দময়ন্তী সর্পগ্রাসে পতিত। কে

তাঁকে আজ রক্ষা করিবে? যদি কখনো তুমি এই সংবাদ শোন, কে তোমাকে সান্ত্বনা করিবে? আবার যদি কখনো তুমি রাজ্যেশ্বর হও, আমার এই দারুণ মৃত্যুর স্মৃতিতে সে রাজ্য-ভোগও যে তোমার সুখের হইবে না!"

সহসা পশ্চাৎ হইতে এক ব্যাধ শর নিক্ষেপে অজগরের প্রাণ বিনাশ করিল। মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা পাইয়া দময়ন্তী আর এক বিপদে পড়িলেন। ব্যাধ তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রণয়ার্থী হইল। অনুনয় ও মিষ্ট সম্ভাষণ ব্যর্থ হইলে, সে বলপ্রকাশে উদ্যত হইল। রোষোদ্দীপ্ত সিংহীর ন্যায় দময়ন্তী প্রজ্বলিত নেত্রে ব্যাধের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"পাপিষ্ঠ! তোর এতবড় আস্পর্দ্ধা? দূর হ, কোন্ সাহসে তুই আমায় স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছিস্!"

প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় তেজস্বিনী সতীর তেজোপ্রভাবে ব্যাধ ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে সতীর সেই তেজে দগ্ধ হইয়া ব্যাধ প্রাণত্যাগ করিল।

নলের অন্বেষণে দময়ন্তী বনে বনে গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিধানে ছিন্নবসন, কেশপাশ আলুলায়িত, শীর্ণ অঙ্গ ধূলি-ধূসরিত; উন্মাদিনী মনে করিয়া কেহ স্নেহ করিত, কেহ বিদ্রূপ করিত, কেহ তাঁহার গায়ে জল দিত, ধূলি উড়াইত, ঢিল ছুঁড়িত। ক্রমে একদল বণিকের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এই বণিকদল চেদী রাজ্যে যাইতেছিল। দময়ন্তী তাহাদের সঙ্গে চেদীরাজ্যে গেলেন। একদিন তিনি রাজপথে

দিয়া যাইতেছেন, উন্মাদিনী মনে করিয়া বালকগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া নানাবিধ বালকসুলভ বিদ্রূপ ও কৌতুক করিতে-করিতে যাইতেছে,—এমন সময়, চেদীরাজের মাতা রাজপ্রাসাদের ছাদ হইতে তাঁহাকে দেখিলেন। দময়ন্তীর অবস্থা দেখিয়া রাজমাতার বড় দয়া হইল। তিনি ধাত্রীকে পাঠাইয়া দময়ন্তীকে অন্তঃপুরে আনাইলেন। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে দময়ন্তী রাজমাতাকে কহিলেন,—"মা, আমি বড় দুঃখিনী। আমি সৎকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যোগ্য স্বামীর হাতে পড়িয়াছিলাম। কিন্তু তিনি পাশা খেলায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এখন আমি পথে পথে তাঁ'র অনুসন্ধান করিতেছি। কিন্তু মা, অনেকদিন পথে পথে কত দেশে ঘুরিলাম, কোথাও স্বামীর সন্ধান পাইলাম না।"

রাজমাতার বড় দুঃখ হইল। তিনি কহিলেন,—"মা, তুমি একা স্ত্রীলোক। এই রকম পথে পথে ঘুরিয়া কি স্বামীর সন্ধান করিতে পারিবে? তুমি আমার কাছে থাক। আমার লোকেরা তোমার স্বামীর অনুসন্ধান করিবে। হয় তো, দৈবাৎ তিনি এখানেও কখনো আসিতে পারেন।"

দময়ন্তী কহিলেন,—"মা, আপনি দয়া করিলে, সৈরিন্ধ্রী হইয়া আমি এখানে থাকিতে পারি। কিন্তু আমি কখনো কাহারো উচ্ছিষ্ট খাইব না, কাহারো পা ধোয়াইব না, বা, কোন পুরুষের সঙ্গে আলাপ করিব না। কোন পুরুষ আমাকে অপমান করিলে আপনি তা'র উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিবেন।"

রাজমাতা কহিলেন,—"আচ্ছা মা, তাহাই হইবে। তুমি এইখানে থাক।"

আপন কন্যা সুনন্দাকে ডাকিয়া রাজমাতা কহিয়া দিলেন,—"এই দুঃখিনী সৈরিন্ধ্রী আমার আশ্রিতা হইয়াছে। তুমি ইহাকে সখীরূপে গ্রহণ কর। কখনো ইহার অসম্মান করিও না।"

সুনন্দা সস্নেহে দময়ন্তীকে নিয়া নিজ গৃহে গেলেন। রাজমাতা দময়ন্তীর মাসী। তিনি অতি শিশুকালে মাত্র একবার দময়ন্তীকে দেখিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। দময়ন্তীও আত্মপরিচয় দিলেন না। সুনন্দার সঙ্গে দময়ন্তী চেদীরাজপুরীতে বাস করিতে লাগিলেন।

(৬)

এদিকে দময়ন্তীর পিতা বিদর্ভরাজ ভীম, নলের রাজ্যনাশ এবং নলদময়ন্তীর বনবাসের কথা শুনিয়া, তাঁহাদের অনুসন্ধানের জন্য নানাদেশে ব্রাহ্মণগণকে পাঠাইলেন। সুদেব নামক এক ব্রাহ্মণ নানাদেশ ঘুরিয়া চেদীরাজ্যে আসিলেন। চেদীরাজগৃহে দময়ন্তীকে দেখিয়াই তিনি চিনিলেন। চেদীরাজমাতা দময়ন্তীর পরিচয় পাইয়া বড় সুখী হইলেন। দময়ন্তীর প্রতি কন্যাবৎ তাঁহার স্নেহ হইয়াছিল, নিজের ভগিনীর কন্যা জানিয়া, তাঁহাকে স্নেহালিঙ্গনে ও মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিলেন। পরে নানাবিধ বহুমূল্য উপহার দিয়া উপযুক্ত রক্ষক ও যান সহ দময়ন্তীকে তাঁহার পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

বহুদিন যাবত নানা দুঃখের পর পিতৃগৃহে আসিয়া পুত্রকন্যার মুখ দেখিয়াও দময়ন্তী সুখী হইতে পারিলেন না। নল কোথায়? তিনি কি অবস্থায় কোথায় আছেন? এই এক মাত্র চিন্তা তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল।

কন্যার দুঃখে দুঃখিত হইয়া রাজা ভীম, নলের অনুসন্ধানের জন্য পুনর্ব্বার অনেকগুলি বিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিলেন। দময়ন্তী তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"আপনারা দেশে দেশে যেখানে যেখানে জনসমাগম দেখিবেন, সেখানে সেখানে এই শ্লোকগুলি গান করিবেন। ইহা শুনিয়া যদি কেহ কোন উত্তর দেয়, তখনি তাহা আমাকে জানাইবেন।"

সেই শ্লোকগুলি এই,—

'শঠ! তুমি তোমার পতিব্রতা স্ত্রীকে একাকিনী বনের মধ্যে ফেলিয়া কোথায় গিয়াছ? অর্দ্ধবস্ত্র পরিয়া সে রাত্রিদিন কেবল তোমার জন্য কাঁদিতেছে। তুমি তা'র কথার উত্তর দাও। স্বামী স্ত্রীকে চিরদিন রক্ষা করিবে, প্রতিপালন করিবে, ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও তুমি কেন তোমার স্ত্রীকে নিরাশ্রয় অবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া গেলে? সদয় হইয়াও কেন তুমি নির্দ্দয় হইলে? দয়া কর, দুঃখিনী বিরহিনীকে আর কষ্ট দিও না। তোমার বিহনে সে আর বেসি দিন জীবিত থাকিবে না।"

ব্রাহ্মণগণ দয়মন্তীর উপদেশ লইয়া নানাদেশে প্রস্থান করিলেন।

নল তখন ছদ্মবেশে অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণের গৃহে সারথির কার্য্য করিতেছিলেন। অশ্বচালনায় তাঁহার অদ্বিতীয় শক্তি

ছিল। তাই তিনি সারথির কার্য্য গ্রহণ করেন। দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া নল যখন বনের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন, তখন সেই বনে ভয়ঙ্কর দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। নল শুনিতে পাইলেন, কে চীৎকার করিতেছে,—"কোথায় পুণ্যশ্লোক নল, এ বিপদে আমাকে রক্ষা কর!" কাতরধ্বনি শুনিয়া নল সেই দাবানলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কার্কোটক নামে এক বৃহৎ সর্পকে দেখিতে পাইলেন। সে-ই নলের সাহার্য্য প্রার্থনা করিয়াছিল। নল কার্কোটককে দাবানল হইতে বাহিরে আনিলেন। আনিবামাত্র কার্কোটক তাঁহাকে দংশন করিল;—দংশনমাত্র নলের রূপ বিকৃত হইয়া গেল। নল কহিলেন,—"উঃ!—কি? তোমার প্রাণ রক্ষা করিলাম, এখন কি তা'র এই প্রতিদান করিলে?" কার্কোটক কহিল,—"মহারাজ, আমি আপনার উপকারই করিয়াছি। কিছুকাল আপনাকে ছদ্মবেশে থাকিতে হইবে; বিকৃত রূপে তাহার পক্ষে সুবিধাই হইবে। আমার বিষে আপনার কোন যন্ত্রণা হইবে না—কিন্তু আপনার দেহাশ্রিত কলি যতদিন আপনার দেহে থাকিবে, এই বিষে জ্বলিবে। এই বসন আপনাকে দিলাম, ইহা পরিয়া যখনই আমাকে স্মরণ করিবেন, তখনই আপনার নিজ রূপ ফিরিয়া পাইবেন। আপনি অযোধ্যারাজ ঋতুপর্ণের সারথ্য গ্রহণ করুন। তিনি অক্ষবিদ্যায় সুনিপুণ, আপনার অশ্বচালন বিদ্যা তাঁহাকে দিয়া আপনি তাঁহার অক্ষবিদ্যা গ্রহণ করিবেন। এবং সেই বিদ্যাবলে আপনার রাজ্য আপনি আবার জয় করিবেন।"

কার্কোটকের উপদেশমত বিকৃতরূপ নল বাহুক নামে ঋতুপর্ণের সারথি হইয়া অযোধ্যায় রহিলেন।

পর্ণাদ নামে এক ব্রাহ্মণ নলের অনুসন্ধানে অযোধ্যায় আসিলেন।—ঋতুপর্ণের রাজসভায় একদিন তিনি দময়ন্তীর সেই শ্লোক গান করিলেন। বাহুক তাঁহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া নিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি বলিলেন।— "কুলস্ত্রীরা বিপদে পড়িলে ধৈর্য্যহারা হন না। ধর্ম্মবলে আপনাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। স্বামী তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেও তাঁহারা স্বামীর প্রতি রুষ্ট হন না; আপনারাই আপনাদিগকে রক্ষা করেন। দারুণ মনঃপীড়ায় ব্যথিত হইয়া দময়ন্তীর হিতার্থেই নল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সুশীলা দময়ন্তীর তাঁহাকে ক্ষমা করা উচিত। নল রাজ্যভ্রষ্ট, শ্রীহীন ও রূপহীন হইয়া পরগৃহে অতি কষ্টে দিনযাপন করিতেছেন, এই অবস্থা জানিয়া দময়ন্তী তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন।"

পর্ণাদ অনুসন্ধানে আরও জানিলেন যে, বাহুক রন্ধনে অতি নিপুণ এবং দ্রুত অশ্বচালনে তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই।— পর্ণাদ অবিলম্বে বিদর্ভে ফিরিয়া দময়ন্তীকে সকল ঘটনা বলিলেন।

দময়ন্তী বুঝিলেন. এই বাহুকই নল। কোন দৈবঘটনায় হয় তো তিনি বিকৃতরূপ হইয়াছেন। মাতার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তিনি সুদেবকে আবার অযোধ্যায় পাঠাইলেন। যাইবার সময় সুদেবকে বলিলেন,—"আপনি অযোধ্যায় পৌঁছিয়াই ঋতুপর্ণকে

বলিবেন, ক'াল প্রাতেই পতিপরিত্যক্তা দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর হইবে। যদি দময়ন্তীকে লাভ করিবার বাসনা থাকে, তবে তিনি যেন অবিলম্বে বিদর্ভে উপস্থিত হন।” দময়ন্তী জানিতেন, নল ব্যতীত আর কেহই একদিনের মধ্যে অশ্ব চালাইয়া অযোধ্যা হইতে বিদর্ভে আসিতে পারিবে না। যদি বাহুক ঋতুপর্ণকে একদিনের মধ্যে বিদর্ভে আনিতে পারে, তবে সেই বাহুকই নল।

সুদেব অযোধ্যায় গিয়া ঋতুপর্ণকে এই সংবাদ দিলেন। বাহুকের অশ্বচালনা কৌশলে ঋতুপর্ণ সেই দিন সন্ধ্যাগমের মধ্যেই বিদর্ভে উপস্থিত হইলেন। নলের অশ্বচালনার কৌশলে মুগ্ধ হইয়া ঋতুপর্ণ তাঁহাকে আপনার অদ্বিতীয় অক্ষবিদ্যা দান করিয়া তাঁহার অশ্বচালনা বিদ্যা গ্রহণ করিলেন। নল অক্ষবিদ্যা লাভ করিবামাত্র কার্কোটকের বিষে জর্জ্জরিত কলি নলের দেহমধ্যে আর থাকিতে না পারিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

দময়ন্তী ঋতুপর্ণকে যে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন, ভীম সে সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। সহসা ঋতুপর্ণকে দেখিয়া তিনি তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋতুপর্ণও স্বয়ম্বরের কোন আয়োজন না দেখিয়া— এবং ভীমের এই প্রশ্ন শুনিয়া যার-পর-নাই বিস্মিত ও অপ্রতিভ হইলেন। তিনি কহিলেন,— “মহারাজ, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।”

এ কথা ভীমের বিশ্বাস হইল না। যাহা হউক, রাজ-অতিথি উপস্থিত; উপযুক্ত সংকারে তিনি মনোনিবেশ করিলেন।— বাহুক রথশালায় রথ রাখিয়া নিকটে বিশ্রাম করিতে লাগিল।

(৭)

রাজপ্রাসাদের উপর হইতে দময়ন্তী বাহুককে দেখিলেন। নল বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু বাহুকের বিকৃত রূপ দেখিয়া কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তখন কেশিনী নাম্নী কোন সখীকে বাহুকের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কেশিনী বাহুকের কাছে বসিয়া নানাকথা পাড়িল; কত কি জিজ্ঞাসা করিল। পরে কহিল,—"দময়ন্তী যে, অযোধ্যায় এক ব্রাহ্মণ পাঠাইয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণ যে শ্লোক গাইয়াছিল, তাহার তুমি কি উত্তর দিয়াছিলে আবার বলিতে পার?"

বাহুক অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহার উত্তর আবার বলিলেন। কেশিনী আসিয়া দময়ন্তীকে সব বলিল। দময়ন্তী বলিলেন,—"তুমি যাও। কোন কথাবার্ত্তা বলিও না। চুপ করিয়া বাহুকের কাজকর্ম্ম সব দেখ। অলৌকিক কোন কাজ দেখিলে আমাকে জানাইবে।"

কেশিনী আবার গেল। বাহুকই ঋতুপর্ণের জন্য রন্ধন করিতেন। ঋতুপর্ণের আহারের জন্য ভীমরাজ অন্যান্য খাদ্য-সামগ্রীর সঙ্গে অনেক মাংস পাঠাইয়াছিলেন। সেই মাংস ধুইবার জন্য, শূন্যকলসীর দিকে বাহুক চাহিবামাত্র—কলসী জলপূর্ণ হইল। রন্ধনের জন্য বাহুক কাষ্ঠ হাতে লইবামাত্র তাহাতে আগুন জ্বলিয়া উঠিল।—(স্বয়ম্বরের পর দেবগণের বরে নল এই সব অলৌকিক শক্তি পাইয়াছিলেন।) কেশিনী আসিয়া দময়ন্তীকে সব জানাইল। আরও পরীক্ষার জন্য দময়ন্তী

কেশিনীকে বাহুকের পাককরা কিছু মাংস আনিতে বলিলেন।—কেশিনী মাংস লইয়া আসিল। দময়ন্তী খাইয়া দেখিলেন, সেই আশ্চর্য্য স্বাদ!—এ স্বাদ তিনি পূর্ব্বেও অনেক পাইয়াছেন। এরূপ স্বাদ নল ভিন্ন আর কাহারও রাঁধা মাংসে সম্ভবে না। এই সব লক্ষণে দময়ন্তী স্থির বুঝিলেন, এই বাহুকই নল।

কিন্তু, নলের সেই অতুল রূপ কি করিয়া এমন বিকৃত হইল? এ সমস্যা দময়ন্তী কিছুতেই পূরণ করিতে পারিলেন না। আবার পরীক্ষার জন্য, দময়ন্তী কেশিনীর সঙ্গে পুত্রকন্যা ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনাকে বাহুকের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।—

বহুদিন পর পুত্রকন্যাকে দেখিয়া নল আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি পুত্রকন্যাকে কোলে নিয়া তাহাদিগকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া তাহাদিগকে নামাইয়া কেশিনীকে কহিলেন,—"আমার এইরূপ—দুইটি পুত্রকন্যা আছে। তাই ইহাদিগকে দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম, তুমি ইহাতে কিছু মনে করিও না।"

কেশিনী আসিয়া দময়ন্তীকে সব বলিল। দময়ন্তী এবার নিঃসন্দেহ হইলেন। কোন দৈবঘটনায় নলের রূপ বিকৃত হইয়াছে—ইহাই তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল।—নিজে একবার বাহুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিলেন। পিতামাতাকে সমস্ত ঘটনা জানাইয়া বাহুককে অন্তঃপুরে আনাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

ভীমরাজের অনুরোধে বাহুক অন্তঃপুরে আসিলেন। দ্বিতীয় স্বয়ম্বর ঘোষণায় নল দময়ন্তীর উপর একেবারে শ্রদ্ধা হারাইয়াছিলেন। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া দময়ন্তী দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এই দুঃখে ও অভিমানে তিনি এতক্ষণ আত্মপরিচয় দেন নাই। এখন দেখিলেন, দময়ন্তীর পরিধানে সেই ছিন্ন অর্দ্ধ-বস্ত্রখণ্ড। কেশপাশ রুক্ষ ও আলুলায়িত। শরীর শীর্ণ ও বিবর্ণ। নলের মনে হইল, এই স্বয়ম্বর-ঘোষণা বুঝি ছলনা!

সহসা দময়ন্তী নলের পদতলে পতিত হইলেন। উভয়ের পরিচয় হইয়া গেল!

আত্মপরিচয় দিয়া, নল দ্বিতীয় স্বয়ম্বরের কথা উল্লেখ করিয়া—অভিমান প্রকাশ করিয়া দময়ন্তীকে অনুযোগ করিলেন। দময়ন্তী কাঁদিতে কাঁদিতে দ্বিতীয় স্বয়ম্বর ঘোষণার কারণ নলকে বুঝাইলেন। নলের মন হইতে সমস্ত সন্দেহ দূর হইল। তখন তিনি নিজরূপ ধারণের ইচ্ছায় কার্কোটক-প্রদত্ত বসন পরিয়া তাহাকে স্মরণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে বিকৃতরূপ বাহুক পরমসুন্দর তেজোপূর্ণরূপ নলরাজায় পরিবর্ত্তিত হইলেন।

বহুদিন দুঃখের ও বিরহের পর শুভমুহূর্ত্তে পতিপত্নীর শুভ-মিলন হইল। সমস্ত নগরে আনন্দোৎসব আরম্ভ হইল। ঋতুপর্ণ আনন্দে নলকে বন্ধুরূপে আলিঙ্গন করিলেন। দময়ন্তী-লাভের আশায় নিরাশ হইয়াও মহাপ্রাণ ঋতুপর্ণের মনে কোন দুঃখ বা ঈর্ষ্যা হইল না।

একমাস শ্বশুরগৃহে থাকিয়া তাঁহার প্রদত্ত বহু ধন রত্ন ও লোকজন সহ সস্ত্রীক নল, নিষধে উপস্থিত হইলেন। ঋতুপর্ণ-প্রদত্ত অক্ষবিদ্যাবলে কলিমুক্ত নল পুষ্করকে অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত করিয়া নিজের রাজ্যধন সমস্ত ফিরিয়া পাইলেন। পরাজিত ও বিপন্ন পুষ্করকে নল কহিলেন,—"পুষ্কর, তুমি আমার কনিষ্ঠভ্রাতা, তুমি যাহাই করিয়া থাক, আমি তোমার প্রতি স্নেহহীন নহি। আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তোমার নিজের ধনসম্পত্তি সকলই তোমাকে ফিরাইয়া দিতেছি।—তুমি স্বচ্ছন্দ-সুখে পূর্ব্বের মত আমার রাজ্যে বাস কর।"

বিদুলা।

(কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে পুত্রগণের উৎসাহ বর্দ্ধনের নিমিত্ত কুন্তী এই আখ্যান বিবৃত করেন।)

মাতা চিরদিনই পুত্রের মঙ্গলপ্রার্থিনী। কিন্তু, দেশ, জাতি ও সমাজের অবস্থানুসারে এই মঙ্গলের আদর্শ বিভিন্ন হইয়া থাকে। বর্ত্তমানকালে অধঃপতিত এই বঙ্গদেশের জননীরা যে কোন অবস্থাতেই হউক, সুস্থদেহে কোন মতে জীবনধারণই পুত্রের একমাত্র মঙ্গল বলিয়া মনে করেন। কিন্তু, পূর্ব্বকালে, ভারতের গৌরবের দিনে, মনুষ্যত্ব, মহত্ব ও বীরত্বগৌরবই হীনজীবন অপেক্ষা পুত্রের পক্ষে অধিকতর মঙ্গল জনক বলিয়া জননীরা বিবেচনা করিতেন,—তাই এই মঙ্গলের জন্য পুত্রের মৃত্যুও জননীরা অমঙ্গল বলিয়া মনে করিতেন না। তাই মৃত্যু অপেক্ষা পুত্রের কাপুরুষতায় তাঁহারা অধিক ব্যথিত হইতেন। তাই প্রাণভয়ে ভীত পুত্রকে ধিক্কার বাক্যে উত্তেজিত করিয়া সমরক্ষেত্রে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন না। পুত্রের এইরূপ উচ্চতম মঙ্গলাকাঙ্খিণী,—পুত্রের বীরত্বগৌরবে গৌরবিনী কাপুরুষতায় বিষাদিনী ক্ষত্রিয়তেজে তেজস্বিনী জননীর আদর্শ-স্থানীয়া বলিয়াই কুন্তী পুত্রগণকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য তাহাদের নিকট সঞ্জয় জননী, বিদুলার ইতিহাস বলিয়াছিলেন।

বিদুলার মত তেজস্বিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াও সৌবীররাজ সঞ্জয় ভীরু ও কোমল প্রকৃতির যুবক ছিলেন। সিন্ধুরাজের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সঞ্জয় প্রাণভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া, নিজ গৃহে শুইয়া শিশুর ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

বিদুলা পুত্রের গৃহে উপস্থিত হইলেন। পুত্রের অবস্থা দেখিয়া সেই আগুনের মত মূর্ত্তি তেজোময়ী জননী ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া কহিলেন,—"কাপুরুষ! প্রাণভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া আসিয়া এখন ভীত রমণীর মত কাঁদিতেছ? ধিক্ তোমাকে! তুমি কি তোমার পিতার ঔরসে আমার গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ, না কোন হীনকুল হইতে আসিয়া এই রাজ্যে রাজ্যেশ্বর হইয়াছ? পুরুষত্বহীন পশু! তোমার কীর্ত্তি নষ্ট হইয়াছে, রাজ্য শত্রুজিত হইল, কেন আর বৃথা জীবনধারণ করিতেছ! পরের পরাক্রম সহ্য করিতে পারে বলিয়াই পুরুষের নাম পুরুষ। যে, স্ত্রীলোকের মত নিরীহভাবে জীবনধারণ করে,— যে, শত্রুর ভয়ে প্রাণ লইয়া পলায়ন করে, তা'র পুরুষ-নামের স্বার্থকতা কি? স্ত্রীলোকেরও মহত্ত্ব আছে, স্ত্রীলোকও পৃথিবীতে হীন হইয়া থাকিতে চায় না, স্ত্রীলোকেরাও মহৎচরিত্রে পৃথিবীতে যশস্বিনী হইয়া থাকে! কিন্তু তোমার মত যাহারা হীন হইয়া থাকিতে চায়, তোমার মত যাহারা লোকসমাজে ঘৃণিত জীবন বহন করে, তাহারা পুরুষ নয়, স্ত্রীলোকও নয়,—অধম ক্লীব! কুলনাশক অমঙ্গলরূপ স্বয়ং কলি তুমি পুত্ররূপে আমার

গর্ভে জন্মিয়াছ! তুমি শত্রুর মুখ হাসাইলে,—বান্ধবজনের মুখে কালী দিলে। এমন তেজোবীর্য্যহীন কাপুরুষ—মাতার মলস্বরূপ পুত্র—যেন কোন রমণী গর্ভে ধারণ না করে! সঞ্জয়! এখনো উঠ, জাগরিত হও, শত্রুহস্তে পরাজিত হইয়া অমন অবসন্ন হইয়া থাকিও না! শত্রুবিজিত, রাজ্যভ্রষ্ট, লোকসমাজে নিন্দনীয় হইয়া দীন-ভিক্ষুকের হীন লাঞ্ছিত জীবন তোমাকে বহন করিতে হইবে।—এ হীন জীবন অপেক্ষা মৃত্যুও কি তোমার ভাল নয়? যদি শত্রুকে জয় করিতে—দেশরক্ষা করিতে না পার, তবে বীরের মত, শক্তির শেষ পর্য্যন্ত শত্রু নাশ করিতে করিতে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ কর। লোকে বলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পতন সময়েও শত্রুর জঙ্ঘা ধরিয়া তাহার সঙ্গে পতিত হন!"

জননীর তীব্র বাক্যে ব্যথিত সঞ্জয় কহিলেন,—"মা, আমার মৃত্যুতে কি তুমি সুখী হইবে? আমি তোমার একমাত্র পুত্র, আমি মরিলে, পৃথিবীতে তোমার সুখের আর কি রহিল?"

বিদুলা কহিলেন,—"পুত্র!—সাধে কি তোমার মৃত্যু কামনা করি? তুমি বীরকুলজাত রাজপুত্র ও রাজা হইয়া পরাধীন ভিখারী-জীবন বহন করিবে;—যে বংশে কখনো কেহ পরের মুখাপেক্ষী হন নাই,—কখনো কেহ ভীত হইয়া পরের পদানত হন নাই,—সেই বংশে জন্মিয়া তুমি পরের অধীন হইবে, পরের মুখ চাহিবে; যে বংশের রাজগণ অকাতরে ধনদান করিয়াছেন, কখনো কোন প্রার্থীকে বিমুখ করেন নাই, সেই বংশধর তুমি পরপ্রদত্ত ক্ষুদ্র জীবিকায় প্রতিপালিত হইবে;—প্রার্থীর প্রার্থনা

পূরণে, বিপন্নের বিপদ মোচনে, প্রতিপাল্যের প্রতিপালনে, রক্ষণীয়ের রক্ষণে, দুঃখীর দুঃখ দূরীকরণে বঞ্চিত হইবে; এই দৃশ্য দেখা অপেক্ষা কি তোমার মৃত্যুও বাঞ্ছনীয় নয়? যদি এতটুকুও মনুষ্যত্বের অধিকারী হও, যদি ক্ষত্রিয়সন্তান হও—তবে তুমিই কি এই হীনজীবনে পরদত্ত অল্প বিভবে সুখী হইয়া থাকিতে পারিবে? কু-নদী অল্প জলে ভরে, মুষিকের অঞ্জলী অল্প দ্রব্যে পোরে, আর কাপুরুষ যে, সে-ই অল্প লাভে, হীন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে। তাই বলি,—পুত্র, বীরবংশের কলঙ্ক-স্বরূপ শত্রুবিজিত পরানুগৃহিত হীন জীবন কখনো বহন করিও না! ক্ষত্রিয় হইয়া শত্রুর পদানত হইও না! তেজোদৃপ্ত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ক্ষত্রিয়—ভাঙ্গিয়া পড়ে, কখনো নত হয় না। তাই বলি, একবার উঠ পুত্র! ক্ষত্রিয় নাম সার্থক কর,—তোমার সঞ্জয় নাম ব্যর্থ করিও না। যদি জীবন যায়, যাক্! তবু একবার মাত্রও ক্ষত্রিয় তেজে প্রজ্জ্বলিত হও। যে আগুন একবার মাত্র জ্বলিয়াও নিভে, ধূমায়িত তেজোহীন বহুক্ষণ স্থায়ী আগুন অপেক্ষা তাহাও শ্রেষ্ঠ। তাই বলি সঞ্জয়, ধূমায়িত তেজোহীন আগুনের মত, হীন কলঙ্কিত দীর্ঘ-জীবন কামনা করিও না,—একটিবারের জন্যও বীরতেজে প্রজ্জ্বলিত হও। একটিবারের জন্যও জ্বলন্ত প্রভায় জগত উদ্ভাসিত করিয়া—না হয় চিরদিনের মত নির্ব্বাপিত হও!”

সঞ্জয় কহিলেন,—“মা, তুমি কি নিষ্ঠুর! বিধাতা কি লৌহদ্বারা তোমার হৃদয় গঠন করিয়াছেন? বীরত্বাভিমানে তুমি

আত্মহারা হইয়া একেবারে পুত্রস্নেহ বিস্মৃত হইয়াছ ? হীন পুত্রের প্রতি দয়া কর মা, আর অমন নিষ্ঠুর বাক্যে আমাকে ব্যথা দিও না। প্রাণভয়ে ভীত হইয়া আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, আমার প্রাণের দিকে চাও। আমার অমঙ্গল কামনা করিও না।”

বিদুলা উত্তর করিলেন,—“সঞ্জয় ! আমি তোমার মাতা। পুত্রস্নেহই মাতার ধর্ম্ম, পুত্রের মঙ্গলই মাতার প্রধান কাম্য। কিন্তু তোমাকে শ্রীহীন, যশোহীন দেখিয়াও যদি আমি নীরবে থাকি, আমার পুত্রস্নেহ—গর্দ্দভীর ন্যায় পুত্রস্নেহ করা হইবে। ক্ষত্রিয়ত্বই ক্ষত্রিয়ের জীবন,—ক্ষত্রিয় গৌরবই ক্ষত্রিয়ের মঙ্গল। ক্ষত্রিয় মাতা পুত্রের ক্ষত্রিয় জীবন আকাঙ্ক্ষা করেন,—ক্ষত্রিয় গৌরবই পুত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল বলিয়া মনে করেন। তেজ ও বিক্রমহীন ক্ষত্রিয়, চোরের মত ঘৃণিত। কোন্ মাতা চোর পুত্রকে ভালবাসিতে পারেন ? তেজোহীন, উদ্যমহীন, কাপুরুষ পুত্র লইয়াও যে মাতা সুখী হয়, তা'র মাতৃজন্ম বৃথা। হায় !—মুমূর্ষু রোগীর যেমন ঔষধ সেবনে অরুচি হয়, তেমনই আমার এই হিতকর উপদেশ তোমার কষ্টকর বোধ হইতেছে !—কিন্তু পুত্র, জানিও নিতান্ত মোহ ও দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃই আমার কথা তোমার অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে। একবার মন মোহমুক্ত কর, দুর্ব্বুদ্ধি দূর কর ! বুঝিতে পারিবে তোমার কর্ত্তব্য কি, কেন এই মহৎ ক্ষত্রিয় জীবন ধারণ করিয়াছ—কেন, মা হইয়া আমি তোমার প্রাণের দিকে না চাহিয়া তোমাকে যুদ্ধে যাইতে

উত্তেজিত করিতেছি। বুঝিতে পারিবে, যুদ্ধ ও জয়লাভ করিবার জন্যই ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে, শত্রু-বিজিত শত্রু-পদানত হীন জীবন ধারণের জন্য নয়! বুঝিতে পারিবে, শত্রুভয়ে ভীত, পরনির্ভর নিন্দনীয় জীবন অপেক্ষা, শত্রু নাশ করিতে করিতে রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগের গৌরব কত বেসি প্রার্থনীয়! বুঝিতে পারিবে, কর্ম্ম-হীন, উদ্যমহীন, নিশ্চেষ্ট জীবনের চির অভাব অপেক্ষা, কর্ম্মবীরের নিষ্ফল চেষ্টাও কত অধিক সুখের! পুত্র, আবার বলি,—মন স্থির কর,—প্রাণভয়ে ভীত হইও না। প্রাণ দিয়াও মান রাখিতে উদ্যত হও। তুমি আমাকে স্নেহহীন বলিয়া তিরস্কার করিতেছ?—একবার ক্ষত্রিয় মাতার যোগ্য সন্তান হও, ক্ষত্রিয়োচিত তেজে ও বিক্রমে শত্রুকে স্তম্ভিত কর, বীরকুলে জন্ম সার্থক কর, বীরত্ব-গৌরবে জগতে গৌরবান্বিত হও, নিজের সাহসে ও বীরত্বে সৈন্যগণের হৃদয়ে অমিত সাহস ও বীরত্বের সঞ্চার করিয়া দেশের শত্রুকে দেশ হইতে দূর কর, শত্রু-বিজিত রাজ্য উদ্ধার করিয়া, পরপীড়িত প্রজাকে রক্ষা করিয়া রাজধর্ম্ম পালন কর, দেখিবে, মাতার হৃদয়ে যোগ্য পুত্রের জন্য কত স্নেহ কত শ্রদ্ধা নিহিত আছে!”

সঞ্জয় উঠিয়া বসিলেন। জননীর জ্বলন্ত উৎসাহ বাক্যে সঞ্জয়ের হৃদয়ে সাহসের সঞ্চার হইল। নিজের কাপুরুষতায় নিজে লজ্জিত হইলেন। জননীর চরণবন্দনা করিয়া, ‘হয় শত্রু জিনিব, নয় প্রাণ পরিত্যাগ করিব’ এই পণ করিয়া সঞ্জয় যুদ্ধে গমন করিলেন। জননীর অগ্নিময় বাক্যগুলি, রণক্ষেত্রে

সঞ্জয়ের কর্ণমূলে দুন্দুভির মত বাজিতে লাগিল। অদম্য উৎসাহে অতুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া সঞ্জয় সিন্ধুরাজকে পরাজিত করিয়া বিজয়-গৌরবে গৃহে ফিরিয়া জননীর চরণবন্দনা করিলেন।

হায়, হীনকে বীরের জাতি করিয়া তুলিবার জন্য কবে গৃহে-গৃহে বিদুলার মত জননী আবির্ভূতা হইবেন!

কুন্তী।

(১)

পাণ্ডবজননী কুন্তীর মত উন্নত-হৃদয়া তেজস্বিনী নারী জগতে দুর্লভ। বীরত্বে ও মহত্ত্বে পাণ্ডবগণ যেমন জগতে শ্রেষ্ঠ, উন্নত চরিত্রের মহিমায় ও মহত্ত্ব-গৌরবে মনস্বিনী কুন্তীও তেমনি জগতে একরূপ অতুলনীয়া। বীরপুত্রের যোগ্যা জননী-রূপে তিনি আপন গৌরবে আর্য্যভূমি ভারতকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

ইনি যদুবংশীয় রাজা শূরসেনের কন্যা, এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের ভগিনী। ইঁহার প্রকৃত নাম পৃথা। শূরসেন তাঁহার বন্ধু অপুত্রক রাজা কুন্তিভোজের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, যে, তাহার প্রথম সন্তান তাঁহাকে দান করিবেন। সেই অঙ্গীকার অনুসারে শূরসেন পৃথাকে কুন্তিভোজ রাজাকে প্রদান করেন। কুন্তিভোজ নিজ কন্যার ন্যায় পৃথাকে পালন করিতে লাগিলেন। কুন্তিভোজের পালিতা বলিয়া পৃথা কুন্তী নামে পরিচিতা হইলেন।

এই সময় কুরুবংশীয় রাজগণ ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। বর্ত্তমান দিল্লীর নিকটে হস্তিনাপুরে

ইঁহারা রাজত্ব করিতেন। এই কুরুবংশীয় রাজা পাণ্ডুকে কুন্তী স্বয়ম্বরে পতিত্বে বরণ করেন। ধৃতরাষ্ট্র নামে পাণ্ডুর এক জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন, কিন্তু, তিনি জন্মান্ধ বলিয়া কনিষ্ঠ পাণ্ডু হস্তিনাপুরের রাজা হইলেন। গান্ধার দেশের সুবল রাজার কন্যা গান্ধারীর সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ হয়। পরম ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির, মহাবল ভীমসেন, এবং তেজস্বী মহচ্চরিত্র ও মহাবীর অর্জ্জুন ক্রমান্বয়ে কুন্তীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মদ্রদেশের রাজকন্যা মাদ্রী নামে কুন্তীর এক সপত্নী ছিলেন। তিনি নকুল ও সহদেব নামে যমজ সন্তান প্রসব করেন। পাণ্ডুর এই পাঁচপুত্রই পঞ্চপাণ্ডব নামে বিখ্যাত। গান্ধারীর গর্ব্ভে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি একশত পুত্র এবং দুঃশলা নামে একটি কন্যা সন্তান জন্মে। পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্র উভয়েই কুরুবংশীয় হইলেও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণই কৌরব নামে বিখ্যাত হন। কুরু-ক্ষেত্রে কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে যে ভীষণ যুদ্ধ হয়, তাহাই মহাভারতের মুল ঘটনা।

পুত্রগণের জন্মের অল্প পরেই মহারাজ পাণ্ডুর মৃত্যু হইল। মাদ্রী আপন শিশুপুত্রদ্বয়কে কুন্তীর হস্তে সমর্পণ করিয়া পাণ্ডুর সঙ্গেই প্রাণত্যাগ করিলেন। আগন পুত্র ও সপত্নীপুত্র সকলকেই কুন্তী সমান স্নেহে প্রতিপালন করিলেন। নকুল ও সহদেব কখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, কুন্তী তাঁহাদের বিমাতা। সর্ব্ব কনিষ্ঠ বলিয়া বরং কুন্তী নিজ পুত্রগণ অপেক্ষা নকুল-সহদেবকেই অধিক স্নেহ করিতেন।

(২)

পাণ্ডব ও কৌরব-রাজপুত্রগণের মধ্যে যুধিষ্ঠির সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। বয়োপ্রাপ্ত হইলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। বীরত্বে, অস্ত্রশিক্ষায়, ধর্ম্মনিষ্ঠায় ও চরিত্র-গুণে পাণ্ডবগণ কৌরবদের অপেক্ষা সকল রকমে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। দুর্যোধন বাল্যাবধি তাঁহাদিগকে ঈর্ষ্যা করিতেন এবং ঈর্ষ্যা-পরবশ হইয়া নানাপ্রকারে তাঁহাদের অনিষ্ট চেষ্টা করিতেন। ধৃতরাষ্ট্র নিজ পুত্রগণ অপেক্ষা পাণ্ডুপুত্রগণের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিতেন। তিনি নিতান্ত অনুদার প্রকৃতির ছিলেন না; নিজ পুত্রগণের দুশ্চরিত্রতা তিনি বুঝিতেন। অকারণে যে তাহারা পাণ্ডবগণের অনিষ্ট চেষ্টা করে, তাহাও জানিতেন। জানিয়া মনে মনে যে বিরক্ত ও দুঃখিত না হইতেন, এমনও নয়। কিন্তু তবুও অনেক সময় দুর্ব্বলচিত্ত ধৃতরাষ্ট্র কতক ঈর্ষ্যা-পরবশ হইয়া এবং কতক পুত্রস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া, পুত্রগণ যে পাণ্ডবদের অনিষ্ট করিত, তাহার অনুমোদন করিতেন। এই প্রকারে দিন যাইতেছিল।

দুর্যোধনের অনুরোধে ধৃতরাষ্ট্র কুন্তীসহ পাণ্ডবগণকে বারণাবত নামক স্থানে গমন করিতে আদেশ করিলেন। কোনরূপ চক্রান্তের বিষয় তিনি কিছুই জানিতেন না। দুর্যোধনের সহযোগীরা পাণ্ডবদের জন্য বারণাবতে নানাবিধ দাহ্য পদার্থ দ্বারা জতুগৃহ নামে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিল। তাহাদের অভিসন্ধি ছিল, রাত্রিকালে সেই গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া কুন্তীসহ পাণ্ডবগণকে

জীবন্ত দগ্ধ করিবে! কিন্তু পাণ্ডবগণ এই ষড়যন্ত্রের বিষয় জানিতে পারিয়া, যেদিন রাত্রিতে জতুগৃহ দাহের বন্দোবস্ত ছিল, সেই দিন রাত্রিতেই গোপনে পলায়ন করেন। দৈবক্রমে এক নিষাদী আপন পাঁচ পুত্র লইয়া সেই রাত্রিতে ঐ গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল। গৃহদাহে পঞ্চপুত্রসহ নিষাদী পুড়িয়া মরিল। তাহাদের দগ্ধ দেহাবশেষ দেখিয়া সকলেই মনে করিল, গৃহদাহে কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডবের মৃত্যু হইয়াছে।

আবার যদি এইরূপ অমঙ্গল হয়, এজন্য পাণ্ডবগণ আত্ম-প্রকাশ না করিয়া ছদ্মবেশে নানা দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

(৩)

এই অবস্থায় একচক্রা নামক এক নগরে, দরিদ্র ব্রাহ্মণবেশে পাণ্ডবগণ, কুন্তীসহ কোন এক ব্রাহ্মণের গৃহে কিছুদিন অবস্থান করেন। বক নামক এক প্রচণ্ড রাক্ষস ঐ নগরের নিকটে বাস করিত। ঐ নগর তাহারই অধিকারে ছিল। রাক্ষস এই নিয়ম করিয়াছিল যে, ঐ নগরবাসী গৃহস্থগণ পর্য্যায়ক্রমে এক-একদিন এক-একটি লোক নানাবিধ আহার-সামগ্রী লইয়া তাহার কাছে যাইবে। অন্যান্য আহার্য্যের সঙ্গে রাক্ষস তাহাকেও খাইবে। নির্দ্দিষ্ট দিনে ঐ ব্রাহ্মণের পালা উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণের গৃহে ক্রন্দনধ্বনি উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে ব্রাহ্মণ নিজে, তাঁহার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা, প্রত্যেকে নিজের প্রাণদানে পরিবারস্থ অন্য সকলের প্রাণরক্ষার জন্য প্রস্তাব করিলেন।

কুন্তী ও ভীমসেন সেদিন কুটীরে ছিলেন। অন্য চারি ভ্রাতা আহার্য্য সংগ্রহে বাহির হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ও তাঁহার স্ত্রী-পুত্রগণের ক্রন্দন শুনিয়া কুন্তী কুটীরে গিয়া সকল কথা শুনিলেন। একটু হাসিয়া তিনি কহিলেন,—"ঠাকুর, আপনারা কাঁদিবেন না; কিছু ভাবিবেন না। আজ আপনার পালা; আমরাও আপনার এক গৃহেরই লোক। ভীম আপনার হইয়া আহার লইয়া রাক্ষসের কাছে যাইবে।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"সে কি মা? তোমরা আমার অতিথি। অতিথির প্রাণ দিয়া নিজের প্রাণ আমি রক্ষা করিব? এমন অধর্ম্ম কখনো করিতে পারিব না।"

কুন্তী কহিলেন,—"ঠাকুর, সেজন্য আপনি ভাবিবেন না। ভীমকে রাক্ষস মারিতে পারিবে না; সে-ই রাক্ষসকে মারিয়া আসিবে। তা'র শরীরে কত শক্তি, আপনি জানেন না। ইহার পূর্ব্বে সে আরো রাক্ষস মারিয়াছে। আর যদি না-ই পারে, সে আপনার গৃহবাসী, আপনারই পরিবার ভুক্ত একজনের মত। আপনি বৃদ্ধ, সে বলিষ্ঠ যুবক। এমন অবস্থায় আপনাকে রাক্ষসের মুখে পাঠাইয়া,—সে কি তা'র দেহ ও দেহের শক্তি লইয়া ঘরে বসিয়া থাকিতে পারে? বিপন্নকে বিপদ হইতে যদি রক্ষা না করিল, তবে কেন সে তা'র সেই বিপুল বলশালী দেহ ধারণ করিয়াছিল? মা হইয়া কেন আমি তাহার দেহ ও দেহের শক্তি আহারে পুষ্ট করিয়াছিলাম? জীবন থাকিতে এমন অধর্ম্ম ভীম কখনো করিতে পারে না। আমিও

মা হইয়া তা'র এমন অধর্ম্মে অনুমোদন করিতে পারি না। আপনাকে মিনতি করিতেছি, আমাকে ও আমার পুত্রকে এই ধর্ম্ম পালন করিতে দিন্। যদি বলপূর্ব্বক আপনাকে বাধা দিয়া ভীমের যাইতে হয়, তা'ও সে যাইবে; আমিও পাঠাইব। সুতরাং আপনি ইহাতে বাদী হইবেন না।"

ব্রাহ্মণ অগত্যা কুন্তীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

মাতার আদেশে ভীমসেন রাক্ষস সমীপে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এমন সময় যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন। কুন্তীর আদেশে ভীম বকরাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধার্থে গমন করিতেছেন শুনিয়া, যুধিষ্ঠির ভীত ও দুঃখিত হইয়া মাতাকে মৃদুভৎ‍্সনা করিয়া এই সংকল্প পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন।

কুন্তী কহিলেন—"যুধিষ্ঠির! আমাদের আশ্রয়দাতা এই ব্রাহ্মণ-পরিবারের রক্ষার জন্য, এই নগরের হিতের জন্য, ভীমকে আমি এই কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছি। তুমি কেন ইহাতে ক্ষুব্ধ হইতেছ? ভীমের শক্তি তুমিও চক্ষে দেখিয়াছ; নিশ্চয়ই সে এ রাক্ষসকে বধ করিতে পারিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যে কেহই বিপদাপন্ন হউক না, সকলকে রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। আশ্রয়দাতার প্রত্যুপকার করা মানবমাত্রেরই কর্ত্তব্য। আশ্রয়দাতার উপকারের জন্য, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মপালনের জন্য, ভীমকে এই কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছি। ধর্ম্ম পালনে ভীমের ক্ষত্রিয়-জীবন সার্থক হউক। কেন ইহাতে তুমি বাদী হইতেছ

ও দুঃখ প্রকাশ করিতেছ ?” যুধিষ্ঠির লজ্জিত হইয়া কহিলেন, —“মা, যোগ্যকার্য্যেই ভীমকে নিয়োগ করিয়াছেন। আপনার পুণ্যবলে ও আশীর্ব্বাদে ভীম রাক্ষসবধে সমর্থ হইবে।” মাতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুমতি পাইয়া হৃষ্টচিত্তে ভীমসেন পরদিন প্রাতে রাক্ষসবধে গমন করিলেন। আপনার অমানুষিক বিক্রমে রাক্ষসবধ করিয়া ভীম মাতৃসমীপে ফিরিয়া আসিলেন।

(৪)

ইহার কিছুকাল পরে পাণ্ডবগণ পাঞ্চাল রাজ্যে গমন করিলেন। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে এই সময়ে ভারতবর্ষের রাজগণ পাঞ্চালনগরে সমবেত হ’ন। ব্রাহ্মণবেশী পাণ্ডবগণও স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইলেন। ধনুর্ব্বিদ্যায় যিনি বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতে পারিবেন, দ্রুপদ তাঁহাকে অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যময়ী কন্যা দান করিবেন বলিয়া, বহু ঊর্দ্ধে একটি মৎস্য এবং তাহার নিম্নে একটি চক্র স্থাপিত করিয়া প্রচার করিলেন, যে বীর ঐ চক্রের ছিদ্রের মধ্য দিয়া লক্ষ্যবেধ করিতে পারিবে, দ্রৌপদী তাঁহাকেই বরণ করিবেন! ক্রমে ক্রমে উপস্থিত সকল রাজাই লক্ষ্যবেধে অসমর্থ হইলে, ব্রাহ্মণবেশী অর্জ্জুন লক্ষ্যবেধ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করিলেন। অস্ত্রবিশারদ ক্ষত্রিয় রাজগণ যাহা পারিলেন না, একজন ব্রাহ্মণ তাহা পারিয়া সুন্দরী দ্রৌপদীকে লাভ করিলেন, ইহাতে রাজগণ প্রবল ক্রোধে প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া সকলে একত্রে অর্জ্জুনকে আক্রমণ

করিলেন। ভীম ও অর্জ্জুন অতুলনীয় বীরত্ব প্রকাশে সকলকে পরাস্ত করিয়া দ্রৌপদীকে লইয়া মাতার নিকটে গমন করিলেন। কুন্তী গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। বাহির হইতে পাণ্ডবগণ কহিলেন,—"মা, আমরা আজ এক অমূল্য রত্ন লইয়া আসিয়াছি।" কুন্তী গৃহমধ্য হইতে কহিলেন,—"রত্ন পাঁচ ভ্রাতায় ভাগ করিয়া নাও।" মাতৃভক্ত পাণ্ডবগণ মাতৃ-আজ্ঞায় পাঁচজনেই দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন।

ইহার পর পাণ্ডবগণের বৃত্তান্ত আর গোপনে রহিল না। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে হস্তিনাপুরে আনাইয়া রাজ্যের অর্দ্ধেক যুধিষ্ঠিরকে দান করিয়া, খাণ্ডবপ্রস্থে পাণ্ডবগণকে বাস করিতে আদেশ করিলেন। দুর্যোধন হস্তিনাপুরের রাজা রহিলেন। খাণ্ডবপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের রাজধানী হইল ইন্দ্রপ্রস্থ। এই ইন্দ্রপ্রস্থই বর্ত্তমান দিল্লী।

(৫)

কিছুকাল গত হইলে পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ দিগ্বিজয় করিয়া মহা সমারোহে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। পাপমতি দুর্যোধন পাণ্ডবগণের গৌরবে ঈর্ষ্যানলে জ্বলিতে লাগিল। কুট-বুদ্ধি পাপাত্মা মাতুল শকুনির পরামর্শে কৌরবগণ পণে পাশা খেলিবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। পাশাখেলায় শকুনি সিদ্ধহস্ত। যুধিষ্ঠির পাশাখেলার পণে হারিয়া দ্বাদশ বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে বাধ্য হইলেন।

পথে বন্ধ পুত্রগণের বনগমনে কুন্তী কোনরূপ বাধা দিলেন না। দ্রৌপদী পতিগণের সঙ্গে যাইবার জন্য কুন্তীর অনুমতি প্রার্থনা করিলে, তিনি প্রশান্ত চিত্তে তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করিয়া কহিলেন,—"মা, তোমার মত ধর্ম্মশীলা ও গুণবতী কন্যায় ও বধূতে তোমার পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল ধন্য হইয়াছে। স্বামীর প্রতি পতিব্রতার ধর্ম্ম কি, তাহা তোমাকে আমার শিখাইতে হইবে না। তুমি স্বচ্ছন্দে স্বামীর সঙ্গে যাও। বিপদে অধীর হইও না। ভবিতব্যতা অখণ্ডনীয়। বুদ্ধিমতী নারীর কখনও তা'র জন্য চিত্তবিকার ঘটে না। পথে তোমার কোন অমঙ্গল হইবে না। ধর্ম্ম ও গুরুজনের আশীর্ব্বাদ তোমাকে রক্ষা করিবেন।"

দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের কাল পূর্ণ হইলেও দুর্যোধন কোনও মতে পাণ্ডবগণকে তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হইলেন না। সুতরাং কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের আয়োজন হইল। এই যুদ্ধে কুরুকুলের সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। কোনমতে সন্ধি হইলে, ধর্ম্মপ্রাণ কোমল স্বভাব যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধ করিবার বাসনা ছিল না। ভীমার্জ্জুনও কুলক্ষয় আশঙ্কায় এত লাঞ্ছনা ও এত অপমান সত্বেও অন্তরের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের মতের অনুমোদন করিলেন। মিষ্ট বাক্যে দুর্যোধনকে বুঝাইয়া, যাহাতে পাণ্ডবগণকে রাজ্যের অংশ দিয়া সন্ধি করিতে তিনি প্রস্তুত হন, তাহার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে দূতস্বরূপ যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে পাঠাইলেন। পিতা ভ্রাতা অনান্য আত্মীয় স্বজন ও

অমাত্যবর্গ সকলে দুর্যোধনকে অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু বলগর্ব্বিত দুর্যোধন বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমিও যুধিষ্ঠিরকে ফিরাইয়া দিতে সম্মত হইল না। শ্রীকৃষ্ণ, কুন্তীর মত জানিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।

যে কৌরবগণ বাল্যাবধি তাঁহার পুত্রগণের অশেষবিধ লাঞ্ছনা করিয়াছে; যাহারা সভামধ্যে দ্রৌপদীকে অপমানের একশেষ করিয়াছে; যাহাদের চক্রান্তে ত্রয়োদশ বৎসর কাল বনে বনে পুত্রগণ বধূসহ নানা কষ্ট ভোগ করিয়াছে; সেই কৌরবগণের নিকট দীনের ন্যায় যুধিষ্ঠির সন্ধির প্রার্থনা করিতেছেন শুনিয়া, তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়রমণী বীরপ্রসবিনী কুন্তী বড়ই ব্যথিত হইলেন। যাহা হউক, কৌরবগণ সন্ধির প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছে। কিন্তু কোমলপ্রাণ যুধিষ্ঠির, ইহাতেও যদি কেবলমাত্র অসংখ্য লোকবিনাশের ভয়েই যুদ্ধ না করিয়া কৌরবগণের পদানত হন, এই আশঙ্কায়, তীব্র জ্বালাময় বাক্যে, পুত্রগণের জ্ঞাপনার্থ কুন্তী নিজের মনোভাব শ্রীকৃষ্ণকে জানাইলেন।

কুন্তী কহিলেন,—"কৃষ্ণ! জীবনে আমি অনেক দুঃখ পাইয়াছি। আমি বৈধব্য ক্লেশ সহ্য করিয়াছি। পুত্রগণের রাজ্যনাশ ও নির্ব্বাসন সহ্য করিয়াছি। এই ত্রয়োদশ বৎসর যাবত তাহাদের অদর্শন দুঃখও সহিয়াছি। কিন্তু কুরুসভায় বধূ দ্রৌপদীর অবমাননা আমি সহ্য করিতে পারি না। যে দিন দুষ্ট কৌরবগণ-কর্ত্তৃক সভামধ্যে স্বামী ও শ্বশুরগণ সমক্ষে দ্রৌপদীকে লাঞ্ছিত হইতে দেখিয়াছি, সেই দিন হইতে আমার প্রাণে শান্তি নাই।

সেই দিন হইতে প্রিয়তম পুত্রগণকে,—এমন কি, জনার্দ্দন, তোমাকে পর্য্যন্তও আমি প্রিয় বলিয়া বোধ করিতে পারি না। আমি পুত্রবতী, তুমি ও বলদেব আমার সহায়। মহাবীর ভীমার্জ্জুন এখনও জীবিত, কেন তবে আমাকে এ দুঃসহ জ্বালা সহ্য করিতে হইতেছে? ক্ষত্রিয়সন্তান কে কুলবধূর এই অবমাননা সহ্য করিতে পারে? আমার পুত্রগণ ভীমার্জ্জুন ও নকুল সহদেব এখনও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অনুগত হইয়া কি প্রকারে এই অবমাননা সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছে? যুধিষ্ঠিরকে আর কি কহিব? রাজপুত্র ও রাজা হইয়া রাজধর্ম্ম পালনের অভাবে ত'ার পাপসঞ্চয় হইতেছে। বেদার্থজ্ঞানশূন্য হইয়া যে ব্যক্তি কেবল বেদ অধ্যয়ন করে, তাহার বুদ্ধি যেমন নিরন্তর বেদ-শ্লোকের বোধহীন আবৃত্তিতে কলুষিত হয়, সেইরূপ কুলোচিত ধর্ম্মের মর্ম্ম না বুঝিয়া কেবল বাহিরের সাধারণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে যুধিষ্ঠিরেরও বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়বীর, রাজ্য, প্রার্থনা করে না, দানস্বরূপ গ্রহণ করে না; আপানার বাহুবলে অর্জ্জন করে। পুরাকালে কুবের প্রীত হইয়া রাজর্ষি মুচুকুন্দকে পৃথিবী দান করিয়াছিলেন। কিন্তু মুচুকুন্দ নিজ বিক্রমে অর্জ্জিত রাজ্য ভোগ করিবার বাসনায়, সে দান গ্রহণ করিলেন না! ইহাই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম ও রাজর্ষির ধর্ম্ম। আজ এই রাজধর্ম্ম ভুলিয়া যুধিষ্ঠির দীন ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণের ন্যায় রাজ্যপ্রার্থনা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তিনি ক্ষত্রিয়, ভিক্ষাবৃত্তি কখনও তাঁহার ধর্ম্ম নহে। প্রজার পালন ও বিপন্নের রক্ষা, তাঁহার ধর্ম্ম। বাহুবলই তাঁহার জীবিকা।

পিতৃপিতামহগণের রাজধর্ম্মের উপর তিনি দৃষ্টি করুন। তিনি যে পথ অবলম্বন করিতে প্রস্তুত, তাহা কখনও রাজর্ষিদের ধর্ম্ম নহে। দুর্ব্বল ও অতি দয়ালু ব্যক্তি রাজধর্ম্ম পালন ও প্রজা-রক্ষণে সমর্থ হয় না। তিনি এখন যেরূপ আচরণে উদ্যত হইয়াছেন, কি আমি, কি পাণ্ডু, কি পিতামহ ভীষ্ম, কেহই তাঁহাকে এরূপ শিক্ষা দিই নাই, বা, এরূপ আশীর্ব্বাদ করি নাই। কেশব, যুধিষ্ঠিরকে বলিও, তিনি রাজধর্ম্ম অনুসারে যুদ্ধ করেন, যেন পিতৃপিতামহগণের নাম লোপ করেন না, যেন ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া ভ্রাতাগণের সঙ্গে নিরয়গামী হন না। কৃষ্ণ, তুমি ভীমার্জ্জুন ও নকুল সহদেবকে কহিও, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম যেন তাঁহারা বিস্মৃত হন না। তাঁহাদের মত বীরপুত্রের জননী হইয়া আমি পরাধীন হইয়া আছি, তাহা যেন তাঁহারা স্মরণ করেন। বীর পতির সহধর্ম্মিণী হইয়া দ্রৌপদী যে কুরুসভায় হীনা রমণীর ন্যায় লাঞ্ছিতা ও অবমানিতা হইয়াছিল, তাহা যেন তাঁহারা কখনও বিস্মৃত হন না। আমি দ্রৌপদীকে জানি; বীরত্বাভিমানিনী বীরযোগ্যা বীরনারী কৃষ্ণা, নিশ্চয়ই পতিগণকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিবেন। কেশব, পুত্রগণকে বলিও, তাঁহারা যেন দ্রৌপদীর উপদেশ মত কার্য্য করেন। বলিও, ক্ষত্রিয় নারী যে নিমিত্ত গর্ব্ভধারণ করে, তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা যেন ক্ষত্রিয়নারীর সন্তান প্রসবের সার্থকতার বিপরীত আচরণ না করেন। তাহা হইলে হীন আচরণে চিরদিন জগতে তাঁহারা ঘৃণিত ও নিন্দনীয় হইবেন। আমিও তাঁহাদিগকে চিরদিনের

মত পরিত্যাগ করিব; ক্ষত্রিয়জননী কখনও তেজোহীন পুত্রকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। প্রয়োজন হইলে, ধর্ম্মরক্ষার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়। তাঁহারা তাঁহাদের এই কুলোচিত ধর্ম্ম পালনে, তাহাতেও কুণ্ঠিত না হন।”

এই কথা বলিয়া কুন্তী পুত্রগণের উৎসাহ বর্দ্ধনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের নিকট সঞ্জয় ও বিদুলার ইতিহাস বলিলেন।

বিদুলার তেজোপূর্ণ উৎসাহবাক্য সকল আমূল বর্ণনা করিয়া কুন্তী কহিলেন,—“কেশব, দুর্ব্বলচিত্ত ও অবসাদগ্রস্ত যুধিষ্ঠিরকে এই তেজোবর্দ্ধক উপাখ্যান শুনাইবে। সঞ্জয় যেমন মাতৃবাক্যে উৎসাহিত হইয়া শত্রু জয় করিয়াছিলেন, আমার পুত্রগণও যেন তেমনি আমার বাক্যে উৎসাহিত হইয়া যুদ্ধ করিয়া রাজ্যোদ্ধার ও শত্রুনাশ করে।”

কুন্তীর তেজস্বিতায় যার-পর-নাই হৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীকে অভিবাদন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকট ফিরিয়া গেলেন। আনু-পূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা শুনিয়া এবং বিশেষতঃ জননী কুন্তীর অভিমত জানিয়া পাণ্ডবগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। অবিলম্বে কুরুক্ষেত্রের মহাসমর আরম্ভ হইল।

(৬)

সেই ভীষণ যুদ্ধে একমাত্র জন্মান্ধ বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র, পঞ্চপাণ্ডব এবং অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যুর স্ত্রী উত্তরার গর্ভস্থ এক শিশু ব্যতীত, কুরুকুল ও পাঞ্চালকুল একেবারে বিনষ্ট হইল।

ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহের বহু রাজাও এই যুদ্ধে যোগদান করিয়া নিহত হইলেন। ভীষণ এই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের পর বিজয় লাভেও পাণ্ডবগণ তেমন হর্ষ লাভ করিতে পারিলেন না। কুন্তীদেবীর মনে একরূপ বৈরাগ্যের উদয় হইল। যদিও যুদ্ধার্থে পুত্রগণকে তিনি ঐরূপ উত্তেজিত করিয়াছিলেন, তবুও যুদ্ধান্তে এখন ভারতের বীরকুলনাশে তিনি বিশেষ ব্যথিতা হইলেন। পুত্রগণের বিজয় ও রাজত্ব-গৌরবে উৎফুল্ল না হইয়া পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের এবং হতভাগিনী কৌরবজননী গান্ধারীর সেবা তাঁহার সাংসারিক জীবনের একমাত্র ব্রত হইল।

কিছুকাল পরে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীসহ বনগমনে সংকল্প করিলেন। কুন্তীদেবীও পুত্রগণ এবং পুত্রগণের রাজসংসার পরিত্যাগ করিয়া জীবনের ব্রতস্বরূপ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সেবার জন্য তাঁহাদের সঙ্গে বনগমনে অভিলাষিণী হইলেন।

কুন্তীকে বনগমনে উদ্যতা দেখিয়া, যুধিষ্ঠির তাঁহাকে গৃহে থাকিতে অনেক অনুনয় করিলেন। কিন্তু কুন্তী কহিলেন,—"বৎস, সংসারে আর কোন স্পৃহা আমার নাই। বীরকুলের বিনাশ দেখিয়া প্রাণে যার-পর-নাই নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে। অবশিষ্ট জীবন অরণ্যে তপস্যা এবং তোমার জ্যেষ্ঠতাত ও গান্ধারীর সেবা-শুশ্রূষা করিব, এই আমার বাসনা। তোমরা তাহাতে দুঃখিত হইও না। বৎস, আজ কুরুকুলের ভার তোমার উপর অর্পিত হইয়াছে। অবহিত চিত্তে রাজধর্ম্ম

পালন করিবে। কখনো দ্রৌপদীর অপ্রিয়াচরণ করিও না। ভ্রাতৃগণকে আত্মতুল্য জ্ঞান করিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।”

কিছুতেই কুন্তীকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে না পারিয়া কাতরস্বরে যুধিষ্ঠির কহিলেন,—“মা, এখন পুত্রগণের রাজ্যভোগ এবং রাজধর্ম্ম পালনের সময়ে কেন আপনার এইরূপ বুদ্ধিবিপর্য্যয় হইল? যুদ্ধে জয়ী হইয়া যখন রাজ্যলাভে সুখী ও গৌরবান্বিত হইয়াছি,—তখনই যদি আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন, তবে কেন আমাদিগকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিয়াছিলেন?” কুন্তী কহিলেন,—“বৎস, তোমরা শত্রুগণের চক্রান্তে লাঞ্ছিত ও নির্ব্বাসিত হইয়া অশেষ দুঃখ পাইতেছিলে। সেই দুঃখ দূর করিবার জন্যই তোমাদিগকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিয়াছিলাম। পাণ্ডবকুলবধূ দ্রৌপদী কুরুসভায় কৌরবগণের হস্তে অপমানিতা হইয়াছিলেন, সেই অবমাননার প্রতিশোধ হওয়া উচিত, তাই তোমাদিগকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিয়াছিলাম। তোমরা মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্র হইয়া জগতে হীন হইয়া না থাক, বিনষ্ট বা নিন্দনীয় না হও, ইন্দ্রতুল্য শক্তিশালী হইয়া কখনও শত্রুর বশীভূত তোমরা না হও; বীরকুলশ্রেষ্ঠ হইয়া অবসন্নভাবে কাল যাপন না কর; তাই তোমাদিগকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিয়াছিলাম। আমি নিজের রাজ্যসুখ বা বিষয়সম্ভোগের আশায় ভীষণ বীর-কুলান্তক সমরে তোমাদিগকে নিয়োজিত করি নাই; তোমাদের হিত-সাধনের জন্যই করিয়াছি। আমার সে বাসনা পূর্ণ হইয়াছে; তোমাদের গৌরবে আমি ধন্য হইয়াছি। সংসারে আমার আর

স্পৃহা নাই। আমি বনবাসী শোকার্ত্ত মহারাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং দেবী গান্ধারীর সেবা করিয়া তপস্থায় অবশিষ্ট জীবন যাপন করিব, এই বাসনা করিয়াছি। তোমরা তাহাতে আমাকে বাধা দিও না। আশীর্ব্বাদ করি, পরমসুখে তোমরা রাজ্যভোগ কর। তোমাদের ধর্ম্মবুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত ও মন উদার হউক।"

প্রাণাধিক পুত্রগণের অনুনয় ও কাতর প্রার্থনায় কুন্তী সংকল্পবিচ্যুতা হইলেন না; ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীসহ প্রশান্ত চিত্তে বনগমন করিলেন।

গান্ধারী।

(১)

কৌরব-জননী গান্ধারী নিতান্ত ধর্ম্মশীলা এবং ধর্ম্মতেজে তেজস্বিনী রমণী ছিলেন। মাতা স্বভাবতঃই পুত্রস্নেহে দুর্ব্বলা এবং শতদোষেও পুত্রের প্রতি পক্ষপাতশালিনী হইয়া থাকেন। কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞানবতী উন্নতচরিত্রা তেজস্বিনী গান্ধারী কখনও আপনার পাপিষ্ঠ পুত্রগণের পক্ষ সমর্থন করেন নাই, বরং প্রকাশ্যভাবে অনেক সময় তাহাদের পাপাচরণে তীব্র প্রতিবাদে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র পুরুষ হইয়াও পুত্রস্নেহে অনেক দুর্ব্বলতা দেখাইয়াছেন, কিন্তু নারী গান্ধারীর চরিত্রে এ দুর্ব্বলতা কখনও দেখা যায় নাই। গান্ধারীর জীবনের কয়েকটি চিত্র আমরা এ আখ্যানে অঙ্কিত করিব। পাঠিকাগণ তেজস্বিনী প্রাচীন আর্য্যনারীর অসামান্য মানসিক বলের পরিচয় তাহাতে পাইবেন।

অনেকে অনুমান করেন, ভারতবর্ষের পশ্চিমে এখন যে কান্দাহার প্রদেশ আছে, তাহাই প্রাচীন গান্ধার দেশ। গান্ধারী সেই গান্ধার দেশের রাজা সুবলের কন্যা। যখন জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ হইল, তখন তিনি বস্ত্রখণ্ডে নিজের চক্ষু বাঁধিয়া দেবারাধনা করিয়া এই সংকল্প করিলেন, যে, অন্ধ বলিয়া কখনও স্বামীকে অশ্রদ্ধা বা বিদ্বেষ করিবেন না।—

কুরুরাজ-গৃহে বধূরূপে গান্ধারীর চরিত্র মহাভারতে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি সদাচার, সদ্ব্যবহার এবং সুশীলতায় কৌরবকুলের সকলকেই সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা গুরুজনের সেবা করিতেন এবং সকলকে মিষ্টবাক্যে প্রীত করিতেন। কখনও কাহারও নিন্দা করিতেন না।

গান্ধারীর ভ্রাতা শকুনি নিতান্ত পাপিষ্ঠ ও ক্রূরচরিত্র ছিলেন। চিরদিন শকুনি দুর্যোধনাদির পাপকার্য্যের সহায় ও পরামর্শদাতা ছিলেন। কুরুসভায় পণে পাশা খেলায় যে, পাণ্ডবগণের সর্ব্বনাশ হয়, তাহাও শকুনির পরামর্শ মত। অক্ষবিদ্যাবিশারদ শকুনিই প্রতারণামূলক কপট ক্রীড়ায় বারম্বার ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করেন। শেষে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকেও পণে হারিলেন। দুর্যোধনের আজ্ঞায় দুঃশাসন কেশাকর্ষণে দ্রৌপদীকে সভায় আনিল। দুর্যোধন ও তাঁহার সহযোগীরা দ্রৌপদীকে নানাবিধ কটূক্তি ও বিদ্রূপ বাক্যে অবমাননা করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি সকলেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ তেজস্বী মহাবীর হইলেও, যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণে হারিয়াছেন—দ্রৌপদী এখন দুর্যোধনের অধীন, এই বিবেচনায় সকলে নিরবে রহিলেন। দুর্ব্বল ধৃতরাষ্ট্র পুত্রভয়ে ভীত হইয়া কোন প্রতিকারের চেষ্টা করিলেন না। গান্ধারী অন্তঃপুরে সংবাদ পাইলেন, তাঁহার পাপিষ্ঠ পুত্রগণ কৌরব-কুলবধূকে রাজসভামধ্যে অবমানিত করিয়া—কৌরবকুলের ঘোর অমঙ্গলের সূত্রপাত করিতেছে। গান্ধারী স্থির থাকিতে

পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ সভামধ্যে আগমন করিয়া ইহার প্রতিকারের জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তখন দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহার ও পাণ্ডবগণের দাসত্ব মোচন করিলেন।

ইচ্ছানুরূপ পাণ্ডবগণকে লাঞ্ছিত করিতে পারিল না বলিয়া দুর্যোধন অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইল। কিছুকাল গেল। শকুনির পরামর্শে আবার পাশা খেলিতে যুধিষ্ঠিরকে নিমন্ত্রণ করিতে সে ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করিল। তাহার অভিসন্ধি ছিল যে, এবার পণে হারাইয়া দীর্ঘকালের জন্য পাণ্ডবদিগকে সে নির্ব্বাসিত করিবে। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া যুধিষ্ঠিরকে নিমন্ত্রণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। গান্ধারী দেখিলেন, যে বিবাদের শান্তি হইয়াছে, পাপিষ্ঠ পুত্রগণের চক্রান্তে আবার তাহা উদ্দীপিত হইতে চলিল। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন,—“মহারাজ, তুমি আবার একি সর্ব্বনাশের আয়োজন করিতেছ? দুর্ব্বিনীত পাপিষ্ঠ পুত্রের কথায় কেন আবার এই কুলক্ষয়কর বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে তাঁহাদিগকে অনুমোদন করিতেছ? যে আগুন একবার নিভিয়াছে, কেন তাহা আবার জ্বালিতেছ? পাণ্ডবগণ নিতান্ত ধর্ম্মশীল ও শান্তস্বভাব। তাহারা সহজে কাহারও সঙ্গে বিবাদ করিতে চায় না। কেন এই অনর্থক শত্রুতাসাধনে তাঁহাদিগকে কুপিত করিতে চাহিতেছ? দুর্যোধন তোমার পুত্র, সে তোমারই আজ্ঞাবাহী হইবে,—কেন দুর্ব্বলতা-বশতঃ তাহার বশবর্ত্তী হইয়া তাহার পাপকার্য্যের প্রশ্রয় দিতেছ?

পুত্রস্নেহবশতঃ আপনার জ্ঞান ও ধর্ম্মবুদ্ধি হারাইও না। স্থির-চিত্তে সকল বিবেচনা করিয়া পাপিষ্ঠ পুত্রের পাপাভিলাষে বাদী হও। হায়, এই পাপিষ্ঠ দুর্যোধন যখন জন্মগ্রহণ করে, চতুর্দ্দিকে কুলক্ষণ দেখিয়া ধর্ম্মাত্মা দেবর বিদুর তোমাকে কহিয়াছিলেন, এই শিশু কুলান্তক হইবে, এখনই ইহাকে সংহার করুন, নচেৎ মঙ্গল হইবে না। মহারাজ, তুমি পুত্রস্নেহবশতঃ বিদুরের বাক্য তখন পালন কর নাই, আজ তাই দুর্যোধনের পাপে কুলক্ষয়ের সূচনা দেখিতেছি। এখনও বলিতেছি, মহারাজ, কুরুকুলের মঙ্গলে যদি বাসনা থাকে, কুলপাংশুল দুর্যোধনকে অবিলম্বে পরিত্যাগ কর। নচেৎ, তাহার পাপে যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, কুরুকুল তাহাতে ভস্মীভূত হইবে। কুরুকুললক্ষ্মী চিরদিনের মত কুরুকুল ত্যাগ করিবেন।"

ধর্ম্মের জন্য, কুল রক্ষার জন্য পাপিষ্ঠ পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে স্বামীকে উত্তেজিত করিতে পারেন, এরূপ মহত্ত্ব-গৌরবে গৌরবান্বিতা মাতা পৃথিবীতে কয়টি আছেন? কিন্তু তেজস্বিনীর তেজঃপূর্ণ বাক্য নিস্ফল হইল। ধৃতরাষ্ট্রের মোহান্ধতা ও দুর্ব্বলতা তাহাতে দূর হইল না। ক্ষীণ স্বরে তিনি কহিলেন,—"পুত্রগণের ইচ্ছার অন্যথা হইবে না। ইহাতে যদি কুলক্ষয় হয়, তাহা নিবারণ করা আমার সাধ্য নয়।"

যুধিষ্ঠির আবার পাশা খেলিতে নিমন্ত্রিত হইলেন। এবার দ্বাদশবৎসর বনবাস এবং একবৎসরের অজ্ঞাতবাস পণে খেলায় হারিয়া ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীসহ রাজ্য হইতে ত্রয়োদশ বৎসরের
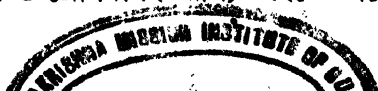
জন্য যুধিষ্ঠির নির্ব্বাসিত হইলেন। এই দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে যুধিষ্ঠির তাঁহার রাজ্যের অংশ চাহিয়া সন্ধির প্রস্তাবসহ শ্রীকৃষ্ণকে হস্তিনাপুরে পাঠাইলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, বিদুর, শ্রীকৃষ্ণ এবং অমাত্য ও মিত্ররাজগণ সকলেই যুধিষ্ঠিরের সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করিতে দুর্যোধনকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু দুর্যোধন বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমিও যুধিষ্ঠিরকে দিবে না বলিয়া পণ করিল। এবং ক্রোধভরে সভা হইতে প্রস্থান করিল।

তখন, ধৃতরাষ্ট্র নিরুপায় হইয়া গান্ধারীকে সভায় আসিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। গান্ধারী সভায় আসিয়া সমস্ত ঘটনা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন,—"রাজন্, আজ তোমারই দোষে এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। ইহার জন্য তুমিই সর্ব্বথা দায়ী এবং তুমিই ইহার জন্য নিন্দনীয় হইবে। পাপিষ্ঠ জানিয়াও তুমি চিরদিন দুর্যোধনের মতের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছ। আজ তুমি বলপূর্ব্বকও তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবে না। ধর্ম্মদ্বেষী অশিষ্ট অবিনীত ব্যক্তি কখনও রাজ্যলাভের যোগ্য নয়। এইরূপ দুরাত্মার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া আজ তাহার উপযুক্ত ফল তুমি ভোগ করিতেছ। পাণ্ডবগণ তোমার স্বজন, আজ কিরূপে তাহাদের সঙ্গে ঘোর বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে? তোমার শত্রুগণ ইহাতে হাসিবে। জগতময় তোমার অকীর্ত্তি ঘোষিত হইবে। যাহা হউক, দুর্যোধন আবার সভায় আসুক। আমার যাহা বক্তব্য আছে বলিব।"

মাতার আদেশে দুর্যোধন আবার সভায় আসিলেন। তখন গান্ধারী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া প্রবোধবাক্যে বুঝাইয়া কহিলেন,—“পুত্র, কেন তুমি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, বিদুর প্রভৃতি গুরুজনের যুক্তিযুক্ত উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না? পাণ্ডবগণ তোমার সুহৃদ, কেন তাহাদের প্রাপ্য রাজ্যাংশ তাহাদিগকে দিতেছ না? তোমরা ও পাণ্ডবগণ সুহৃদ্‌ভাবে নিজ নিজ প্রাপ্য রাজ্যে অধিষ্ঠিত থাকিলে সমস্ত পৃথিবীর শত্রু তোমরা নাশ করিয়া নিষ্কণ্টকে সুখে রাজ্যভোগ করিতে পারিবে। কিন্তু যদি বিবাদে প্রবৃত্ত হও, তবে কুলনাশ, শক্তি নাশ, ও রাজ্যনাশে বহু মনস্তাপ ভোগ করিবে। তোমরা সকলেই স্বজন। স্বজনের মধ্যে বিবাদ করিয়া কেবল নিজেদের সর্ব্বনাশ করিবে আর শত্রুর আনন্দবর্দ্ধন করিবে? বুদ্ধি স্থির কর, গুরুজনদের উপদেশ গ্রহণ কর। অর্দ্ধরাজ্য পাণ্ডবদিগকে প্রত্যর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে সুখে অপরার্দ্ধ ভোগ কর। অর্দ্ধরাজ্যই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। অতি লোভ করিয়া সর্ব্বস্ব হারাইও না। তুমি, কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য এই ষড়রিপুর বশীভুত হইয়া পাণ্ডবগণের অনেক অহিতসাধন করিয়াছ। আজও সেই ষড়রিপুর বশবর্ত্তী হইয়াই গুরুজনের এই যুক্তযুক্ত হিতবাক্য গ্রহণ করিতে পারিতেছ না। ইন্দ্রিয় দমন কর, বুদ্ধি স্থির কর, ইন্দ্রিয়বশীভূত ব্যক্তি কখনও রাজ্যপালনে সমর্থ হয় না। কখনও পৃথিবীতে জয়যুক্ত হয় না। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পাণ্ডবগণের রাজ্যধন অধিকার করা তোমার সাধ্য নয়। মোহ বশতঃ তুমি মনে করিতেছ, ভীষ্ম, দ্রোণ,

কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণ তোমার সহায়তায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিবেন। কিন্তু তাহা কখনও হইবার নহে। এ রাজ্যে তোমার ও পাণ্ডবগণের সমান অধিকার। তাঁহারা তোমরাও পাণ্ডবগণের সকলেরই প্রতি সমান স্নেহশীল। মুর্খ, কি আশায় মনে করিতেছ, ইঁহারা পাণ্ডবগণের বিরুদ্ধে তোমার সহায়তা করিবেন? তুমি রাজা, তোমার অন্নে প্রতিপালিত বলিয়া যদি তোমার সহায়তা করিতে ইঁহারা ধর্ম্মতঃ বাধ্য হন, তবে ইঁহারা বরং প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন, তথাপি ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের অঙ্গে প্রহার করিতে সমর্থ হইবেন না। মোহে ভ্রান্ত হইয়া, লোভপরতন্ত্র হইয়া, মাৎসর্য্যের বশীভূত পাণ্ডবগণের অহিত অভিলাষ করিও না। বিবাদে ক্ষান্ত এবং পাণ্ডবগণের প্রাপ্য রাজ্যাংশ তাহাদিগকে প্রদান নতুবা কুরুকুলের সর্ব্বনাশ হইবে।"

মাতার কথায় ক্রূরমতি পাষাণ হৃদয় দুর্যোধনের মন না। ভীষ্ম দ্রোণাদি এবং সভায় সমবেত অন্যান্য বন্ধু রাজন্যবর্গ আবার দুর্যোধনকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না। তখন গান্ধারী রোষপূর্ণ তীব্রবাক্যে দুর্যোধনকে কঠোর তিরস্কার করিয়া কহিলেন,—"দুর্যোধন, আজ এই সভামধ্যে সকলের সমক্ষে তোমাকে কহিতেছি, তুমি নিতান্ত দুরাত্মা ও দুরাশয়। কুরুবংশীয়গণ পুরুষানুক্রমে এই ভোগ করিতেছেন; তুমি আজ সেই রাজ্য বিনষ্ট করিতে হইয়াছ। ধর্ম্মাত্মা শান্তনুনন্দন ভীষ্ম জীবিত, তোমার পিতা

ধৃতরাষ্ট্র, খুল্লতাত বিদুর জীবিত, তাঁহারা রাজ্য প্রার্থনা না করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক তোমাকে রাজ্য দিয়াছেন, তাই তুমি রাজা। কোন্ সাহসে আজ তাঁহাদের আদেশ অবহেলা করিতেছ? তুমি এ রাজ্যের কে? এ রাজ্যে তোমার কি অধিকার? ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডু এ রাজ্যের রাজা ছিলেন। এখন তাঁহার পুত্র যুধিষ্ঠির এবং তাঁহার পুত্র-পৌত্রগণেরই এ রাজ্যে প্রকৃত অধিকার। আর কাহারও কোন অধিকার নাই। আমি সকলের নিকট নিবেদন করিতেছি, পাপাত্মা দুর্যোধনকে সকলে উপেক্ষা করুন। কুরুকুলশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের মতানুসারে সকলে কার্য্য করুন, —আমার মত আমি ব্যক্ত করিতেছি। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এই রাজ্যের যথার্থ অধিকারী। ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের অনুমোদনে তিনিই কৌরবরাজ্য শাসন করুন।"

দুর্যোধন টলিল না। কাহারও কথা মানিল না। রাজা বলিয়া তাঁহার আদেশ ধর্ম্মভীরু ভীষ্ম দ্রোণ ও অন্যান্য কেহই অবহেলা করিতে পারিলেন না। কৌরব ও পাণ্ডবকুল কুরু-ক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রস্তুত হইল।

(৪)

অষ্টাদশ দিবস ধরিয়া কুরুক্ষেত্রে ভীষণ সংগ্রাম হইল। বীরের পর বীর সহস্রে সহস্রে নিহত হইতে লাগিলেন। প্রতি দিন দুর্যোধন যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে জননীর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে যাইতেন। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণা গান্ধারী প্রতিদিনই দুর্যোধনকে

এক উত্তর প্রদান করিতেন,—"ধর্ম্ম যেখানে, জয়ও সেখানে। অধর্ম্ম কখনও জয়যুক্ত হয় না।"

ক্রমে কৌরবপক্ষীয়েরা সবান্ধবে সবংশে যুদ্ধে নিহত হইলেন।

পুত্র শত অপরাধ করিলেও জননীর প্রাণ একেবারে স্নেহ-শূন্য হইতে পারে না। কোনদিন গান্ধারী পাপিষ্ঠ পুত্রগণের পক্ষ সমর্থন করেন নাই। চিরদিন পুত্রগণকে পাপপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য কঠোর তিরস্কার করিয়াছেন। কুরু-সভামধ্যে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, 'দুর্যোধনের রাজ্যে কোন অধিকার নাই। যুধিষ্ঠিরই রাজ্যের অধিকারী। তিনিই রাজ্য শাসন করুন।' ঘোরতর যুদ্ধের মধ্যে অধর্ম্ম-পথাবলম্বী বলিয়া আশীর্ব্বাদপ্রার্থী পুত্রকে আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত করেন নাই।

কিন্তু আজ গান্ধারী শতপুত্র শোকে, একমাত্র কন্যার বৈধব্যে, পুত্রশোকাতুর দুর্ব্বল বৃদ্ধ পতি ধৃতরাষ্ট্রের করুণ রোদনে, যুদ্ধ-প্রাঙ্গণে মৃত পতিপার্শ্বে পতিতা রোরুদ্যমানা পুত্রবধূগণের দারুণ শোকাবহ হৃদয়ভেদী দৃশ্যে, অসামান্য মানসিকবলসম্পন্না হইলেও, আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না। আত্মহারা হইয়া পাণ্ডবগণকে অভিশাপ করিতে উদ্যত হইলেন।

তখন শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডবগণ সহ, সান্ত্বনা বাক্যে শোকাভিভূতা কুপিতা গান্ধারীর শোক লাঘব ও কোপশান্তির মানসে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

সেই সময় মহর্ষি ব্যাসদেবও সেই উদ্দেশ্যে শোকাভিভূতা গান্ধারীর নিকটে আসিলেন। গান্ধারীকে সম্বোধন করিয়া

ব্যাস কহিলেন,—"মা, তুমি চিরদিন সুশীলা ও ক্ষমাশীলা, আজ কেন কুপিতা হইয়াছ ? যুদ্ধের সময় দুর্যোধন প্রতিদিন তোমার নিকটে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে আসিলে তুমি তাহাকে বলিতে —যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয়। তোমার মত সাধ্বীর বাক্য কখনো মিথ্যা হয় না, তাই কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে ধর্ম্ম জয়যুক্ত হইয়াছে, অধর্ম্ম বিজিত হইয়াছে। আজ মা, সেই কথা স্মরণ করিয়া কোপ শান্তি কর। পাণ্ডবগণকে ক্ষমা কর।"

ব্যাসদেবের কথায় মহানুভবা গান্ধারী উত্তর করিলেন,— "আর্য্য, পাণ্ডবদের প্রতি আমার কোন দ্বেষ নাই। তাহারা যে বিনষ্ট হয় তাহাও আমার অভিপ্রেত নয়। কুন্তী যেমন পাণ্ডব-গণের হিতৈষিণী, আমারও সেইরূপ হওয়া উচিত। আর ইহাও বেশ্ বুঝিতে পারি, যে, আমার পুত্রগণের দোষেই কুরুকুল ক্ষয় হইয়াছে, তাহারা নিজেও বিনষ্ট হইয়াছে। পাণ্ডবগণের ইহাতে কোন অপরাধ নাই। কিন্তু দেব, দারুণ পুত্রশোকে আচ্ছন্ন হইয়া মধ্যে মধ্যে আত্মহারা হই। দুর্ব্বল চিত্ত প্রবোধ মানিতে চায় না। ভীম, দুঃশাসনের বক্ষ চিরিয়া রুধির পান করিয়াছে, একথা যখন মনে হয়, তখন বড় ব্যথিত হই।—নাভির নিম্নদেশে গদাঘাত যুদ্ধনীতি-বিরুদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণের সমক্ষেই ভীম যুদ্ধনীতি লঙ্ঘন করিয়া উরুতে গদাঘাত করিয়া দুর্যোধনের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে। গদাযুদ্ধে দুর্যোধন ভীম অপেক্ষা অধিক নিপুণ ছিল। এইরূপ নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য না করিলে দুর্যোধন সহজে বিনষ্ট হইত না। ভীমের এই নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যে পুত্রের

প্রাণবিনাশের কথা যখনই মনে হয়—তখনই আমার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হয়।"

তখন ভীম বিনীতবাক্যে গান্ধারীকে প্রবোধ দিয়া বুঝাইলেন যে, প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যই তিনি দুঃশাসনের রুধির পান ও দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করিয়াছেন। তখন গান্ধারী আবার কহিলেন,—"দুর্যোধন ও দুঃশাসন তোমাদের নিকট অপরাধ করিয়াছিল। তোমরা তাহাদিগের যোগ্য প্রতিশোধ দিয়াছ। তোমাদিগকে এজন্য আমি দোষী করিব না। কিন্তু, আমার শতপুত্রের মধ্যে অল্প অপরাধী একটি পুত্রকেও যদি জীবিত রাখিতে, তাহা হইলেও বৃদ্ধ অন্ধরাজের এবং এই হতভাগিনীর বৃদ্ধকালের, সে সম্বল হইত। যা'ক্, যাহা হইবার, হইয়াছে। এখন তোমরাই আমাদের পুত্রস্বরূপ।"

পাণ্ডবগণ নানা সান্ত্বনাবাক্যে গান্ধারীকে সন্তুষ্ট করিলেন। গান্ধারীও ক্রোধ সম্বরণ করিয়া পাণ্ডবগণকে জননীর ন্যায় সান্ত্বনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। এই ভীষণ যুদ্ধে উভয়পক্ষই গুরুতর শোক সহ্য করিয়াছেন। পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদী ও সুভদ্রা সকলেই পুত্রশোকের আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নিজের শোকসম্বরণ পূর্ব্বক গান্ধারী পাণ্ডবধূগণকে সান্ত্বনা করিবার জন্য পাণ্ডবগৃহে গমন করিলেন। দ্রৌপদী, সুভদ্রা প্রভৃতি শোকার্ত্তা পাণ্ডববধূগণকে সম্বোধন করিয়া দেবীসদৃশী গান্ধারী, স্নেহবাক্যে কহিলেন,—"মা, আমরা সকলেই সমান পুত্রশোকে কাতর। পরস্পরের দিকে চাহিয়া আমাদের মন শান্ত করিতে হইবে।

এক একবার আমার মনে হয়, বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধানে কাল আপনিই লোকক্ষয় করিয়াছেন। যাহা হউক, আমাদের পুত্রগণ সংগ্রামে নিহত হইয়া উত্তম গতিলাভ করিয়াছেন। এই সান্ত্বনায় আমাদের মন সংযত করা উচিত। আমরা সকলেই সমান শোকার্ত্ত। এই চিন্তা ব্যতীত, কে আর আমাদিগের সান্ত্বনা করিবে? কিন্তু আমার বিশেষ দুঃখ, কর্ম্মদোষে কুপুত্র গর্ব্বে ধারণ করিয়াছিলাম, তাই আজ কুরুকুল বিনষ্ট হইল।”

(৫)

পাণ্ডববধূগণকে সান্ত্বনা করিয়া, গান্ধারী, শ্রীকৃষ্ণ সহ কুরুক্ষেত্রে সমরপ্রাঙ্গণে গমন করিলেন। পুত্র ও পৌত্রগণের, কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় অসংখ্য বীরের ছিন্ন রুধিরাক্ত মৃতদেহ সমরপ্রাঙ্গণে পতিত রহিয়াছে। রক্ত ও মাংসলোলুপ শৃগাল কুক্কুর শকুনি ও গৃধিনিগণ ইতস্ততঃ শবনিরাশির মধ্যে আহার অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কুরুবংশীয় বধূগণ, ভারতের নানাদেশীয় রাজমাতা, রাজমহিষীগণ—বীরজননী ও বীরপত্নীগণ নিজ নিজ পতি-পুত্রগণের ছিন্নদেহ আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতেছেন। গান্ধারী এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিলেন। একে একে শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যেক শোকাবহ চিত্র দেখাইয়া কহিতে লাগিলেন,—“ঐ দেখ কৃষ্ণ, আমার বধূরা আলুলায়িত কেশে, বিচ্ছিন্নবাসে সমরপ্রাঙ্গণে মৃত পতির পাশে পড়িয়া কাঁদিতেছে। কেহ উন্মত্তার ন্যায় ঘুরিতেছে। ঐ দেখ কৃষ্ণ, ভারতের পুত্রহীনা বীরজননী ও পতিহীনা বীরপত্নীগণে সমরক্ষেত্র পূর্ণ হইয়াছে।

ঐ দেখ, পুরুষ ব্যাঘ্র ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অভিমন্যু, দ্রুপদ, শল্য, দুর্যোধন, দুঃশাসন, ভুরিশ্রবা প্রভৃতি অসংখ্য বীরের ছিন্ন মৃতদেহ রুধির কর্দ্দমে বিকৃত হইয়া পড়িয়া আছে। ঐ দেখ, বালিকা উত্তরা অভিমন্যুকে ধরিয়া কাঁদিতেছে। ঐ দেখ, ভানুমতী কখনও নিজ পুত্র লক্ষ্মণের মস্তক আঘ্রাণ করিতেছে কখনও দুর্যোধনের দেহ মার্জ্জনা করিতেছে। ঐ দেখ, পদ্মাবতী কখনও বীরপতি কর্ণের কখনো পুত্রের দেহ আলিঙ্গন করিয়া উন্মত্তবৎ আর্ত্তনাদ করিতেছে। ঐ দেখ, দ্রোণাচার্য্যপত্নী কৃপী, কাঁদিতে কাঁদিতে বৃদ্ধবীরের অন্তেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিতেছেন। ঐ দেখ দুঃশলা, ছিন্নমুণ্ড জয়দ্রথের মস্তক অন্বেষণে পাগলিনীর ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে।—

—ঐ দেখ আমার বালিকাবধূ শৃগাল-গৃধিনীদিগকে তাড়িত করিয়া, যত্নে আমার বালকপুত্র বিকর্ণের দেহ রক্ষা করিতেছে!”

বলিতে বলিতে গান্ধারীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।—কিয়ৎকাল পরে আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি কহিলেন,—“কৃষ্ণ, যেদিন দুর্যোধন দুঃশাসন ও কর্ণ,সভামধ্যে দ্রৌপদীকে অপমান করিয়াছিল, যেদিন সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া পাণ্ডবগণের ন্যায়তঃ প্রাপ্য রাজ্যের অংশদানে অস্বীকৃত হইয়াছিল, সেই দিনই আমি জানি, এই দৃশ্য আমাকে দেখিতে হইবে। যুদ্ধের সময় দুর্যোধন আমার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে গেলে, যখন আমি ‘ধর্ম্ম ভিন্ন অধর্ম্ম জয়যুক্ত হয় না’ বলিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতাম, তখনই আমি জানি, দারুণ পুত্রশোক আমাকে সহিতে হইবে।

কিন্তু আজ এ দৃশ্য দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিতেছি না। আমার একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, পুত্রগণ যতই অধর্ম্ম করিয়া থা'ক্, আজ ঐ বীরশয্যায় শয়ন করিয়া নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ করিয়াছে। কিন্তু কুরুকুল নির্ম্মূল হইল,—ভারতের বীরকুল যে ধ্বংস হইল, কৃষ্ণ, ইহার সান্ত্বনা কি? কৃষ্ণ, অসীম তোমার জ্ঞান, অসীম তোমার শক্তি। তুমি জানিয়া শুনিয়াও এই ধ্বংসে উপেক্ষা করিয়াছ। তুমি ইচ্ছা করিলে, ইহা অবশ্য নিবারণ করিতে পারিতে। শক্তি সত্ত্বেও তুমি তাহা কর নাই। তাই, আজ তোমাকে এই অভি-শাপ দিতেছি, তোমারই জন্য তোমার বিপুল যদুবংশও ধ্বংস হইবে। সেই ধ্বংস চক্ষে দেখিয়া, বনমধ্যে নিকৃষ্ট ভাবে তোমাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।"

(৬)

যুদ্ধের পর কুরুরাজ্য যুধিষ্ঠিরের অধিকৃত হইল। পতি সহ গান্ধারী কিছুকাল পাণ্ডবগণের আশ্রয়ে বাস করেন। এই সময় পাণ্ডবগণ সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহাদের সম্মানরক্ষা ও সন্তোষবিধানে যত্ন করিতেন। কুন্তী অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাঁহাদের সেবা করিতেন। পরে ধৃতরাষ্ট্র সহ গান্ধারী, বনগমন করিয়া তপস্যায় নিযুক্ত হন। সেই বনে অকস্মাৎ দাবানলে, ধৃতরাষ্ট্র, কুন্তী ও অন্যান্য সকলের সঙ্গে গান্ধারীর মৃত্যু হয়।

দ্রৌপদী।

(১)

পাণ্ডব-মহিষী দ্রৌপদী যেন সাক্ষাৎ ক্ষত্রিয়-তেজস্বরূপিনী ছিলেন। কোন কার্য্যে কোনরূপ হীনতা,—অন্যায় অবিচার ও অত্যাচারের কাছে কোনরূপ দীনতা,—কাহারও ন্যায্য অধিকার বলে কেহ হরণ করিলে, তাহার প্রতি উপেক্ষা,—এই তেজস্বিনীর প্রাণে সহ্য হইত না। কেহ সহ্য করিলেও, তিনি তাহাকে মনুষ্যত্বহীন বলিয়া মনে করিতেন।

পিতা, ভ্রাতা, স্বামী বা অন্য গুরুজন—যে কেহ হউন, কাহারও এরূপ হীনতা তিনি ক্ষমা করিতে পারিতেন না। ন্যায়ের রক্ষণে বা অন্যায়ের দমনে, কোনরূপ তেজোহীনতা দেখিলে তীব্র কঠোর বাক্যে গুরুজনকেও তিনি ধিক্কার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু, তাই বলিয়া, অতি দর্প বা দাম্ভিকতা, কি নিষ্ঠুরতা দৌপদীর চরিত্রে কখনও প্রকাশ নাই।

বলগর্ব্বিত শত্রুর দমনে তিনি ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইতেন, কিন্তু, সেই শত্রু, বিজিত হইয়া পদানত হইলে, নির্ম্মলচিত্তে তাহাকে ক্ষমা করিতেন। তিনি আশ্রিত দুর্ব্বলকে স্নেহময়ী জননীর ন্যায় রক্ষা করিতেন। পাণ্ডব-রাজগৃহের গৃহিণী হইয়া দাসীর ন্যায় পোষ্য সকলের সেবা করিতেন। সপত্নীগণকে সহোদরা ভগিনীর ন্যায় স্নেহে আলিঙ্গন করিতেন। সপত্নীপুত্র-

গণকে নিজপুত্রের ন্যায় পালন করিতেন। এদিকে, তিনি যেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী ছিলেন, তেমনি তখনকার ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়ে তিনি সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন। তিনিই বলিয়াছেন যে, যখন পণ্ডিতগণ তাঁহার ভ্রাতাদিগকে নানা নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন, তিনি তখন তাঁহার পিতার কোলে বসিয়া মনোযোগ সহকারে সেই সব শুনিয়া শিক্ষালাভ করিতেন।

এই সর্ব্বগুণশালিনী আর্য্যরমণীর জীবন মহত্ত্বে পরিপূর্ণ।

দৌপদী পাঞ্চাল দেশের রাজা দ্রুপদের কন্যা। পিতার নামানু-সারে তাঁহার নাম হয়। তাঁহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণা। শ্যামবর্ণা ছিলেন বলিয়া পিতা তাঁহার ঐ নাম রাখেন। গৌরবর্ণ না হইলেও যে, স্ত্রীলোক অতি সুন্দরী হইতে পারে, কৃষ্ণাই তাহার দৃষ্টান্ত ছিলেন। রাজা দ্রুপদের এই বাসনা ছিল যে, প্রসিদ্ধ ধনুর্ব্বিদ্ বীর অর্জ্জুনের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেন। কিন্তু দ্রৌপদীর যখন বিবাহের যোগ্য বয়স হইল, তখন, পাণ্ডবগণ জতুগৃহদাহের পর ছদ্মবেশে লুক্কায়িত ছিলেন। সুতরাং দ্রুপদ অতি কঠিন এক লক্ষবেধ পণ করিয়া দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর ঘোষণা করিলেন। ভারতের বিভিন্ন দেশের রাজারা সকলেই পরমা সুন্দরী দ্রৌপদীকে লাভ করিবার আশায় স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইলেন। ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণরূপী পাণ্ডবগণও আসিলেন।

বরমাল্য হাতে করিয়া সুসজ্জিতা দ্রৌপদী সভামধ্যে দাঁড়াইলেন। রাজারা দ্রৌপদীর রূপের কথাই শুনিয়াছিলেন, এখন, চক্ষে তাঁহাকে দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

কিন্তু বৃথা আশা। লক্ষবেধ কেহই করিতে পারিলেন না; অনেকে সেই বিশাল ধনুকে জ্যা-রোপণ পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না। অর্জ্জুনকে জামাতা পাইবার আশাতেই দ্রুপদ ঐরূপ কঠিন লক্ষ্যবেধের পণ করিয়াছিলেন। একমাত্র সূতজাতীয় অঙ্গরাজ কর্ণ, অর্জ্জুনের ন্যায় সুনিপুণ ধনুর্ব্বিদ্ ছিলেন। কিন্তু, কর্ণ যখন ধনুকে জ্যা রোপণ করিয়া—লক্ষ্যবেধে উদ্যত হইলেন, রাজসভা-মধ্যে, দ্রৌপদী নির্ভিকচিত্তে বলিলেন,—"আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না।"

যে কেহ লক্ষ্যবেধে সমর্থ হইবেন, দ্রৌপদী তাঁহাকেই বরণ করিবেন, দ্রুপদের এই পণ সত্বেও, দ্রৌপদীর এই সাহসপূর্ণ বাক্যে রাজগণ স্তম্ভিত হইলেন। কর্ণ আর কি করিবেন,—লজ্জিত হইয়া ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিয়া নিজের আসনে গিয়া বসিলেন।

শেষে, ব্রাহ্মণ-সভার মধ্য হইতে অর্জ্জুন উঠিয়া লক্ষ্যবেধ করিবেন, জানাইলেন। সকলে চমৎকৃত হইয়া গেল। কিন্তু অর্জ্জুন অবহেলে লক্ষবেধ করিলেন। সহর্ষে দ্রৌপদী বীর ব্রাহ্মণ-যুবকের গলায় বরমাল্য অর্পণ করিলেন।

ক্ষত্রিয় রাজারা যাহা পারিলেন না, একজন দীন ব্রাহ্মণ সেই কার্য্য সাধন করিয়া রাজকন্যা দ্রৌপদীকে লাভ করিলেন, ইহা রাজগণের সহ্য হইল না। এই অপমানের প্রতিশোধের জন্য সকলে মিলিয়া অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন। ভীম ও অর্জ্জুন অতুল বিক্রমে সকলকে পরাস্ত করিয়া, দ্রৌপদীকে লইয়া কুটীরে মাতা কুন্তীর নিকটে ফিরিয়া গেলেন।

কুটীরের নিকটে আসিয়া পাণ্ডবগণ কুন্তীকে ডাকিয়া কহিলেন,—“মা,আমরা আজ এক অমূল্য রত্ন লইয়া আসিয়াছি।” মাতা, না দেখিয়া কুটীরের মধ্য হইতেই বলিলেন,—“পাঁচ ভাই সে রত্ন ভাগ করিয়া লও।”

দ্রৌপদীকে দেখিয়া কুন্তী নিজের কথায় বড় অপ্রতিভ হইলেন। মাতার আদেশ লঙ্ঘন করা পাপ বলিয়া পাঁচ ভাই সকলেই দ্রৌপদীকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইলেন। সে রাত্রি দ্রৌপদী কুটীরে রহিলেন। রাজকন্যা আজ কুটীর বাসিনী। কিন্তু স্বামীর বীরত্বে মুগ্ধ বীরঙ্গনা তাঁহার দারিদ্র্যে কুণ্ঠিত হইলেন না। কুন্তীর আদেশে তিনিই রাঁধিয়া পাণ্ডবগণকে আহার করাইলেন। তাঁহারা নিদ্রিত হইলে, তাঁহাদের পায়ের কাছে শুইয়া সুখে ঘুমাইলেন।

পরদিন দ্রুপদ সকলকে রাজগৃহে আনয়ন করিলেন। পঞ্চ ভ্রাতা সকলেই দ্রৌপদীকে বিবাহ করিবেন এরূপ অভূতপূর্ব্ব ব্যবস্থায় প্রথমে তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। পরে, পাণ্ডবগণ কিছুতেই মাতার বাক্য লঙ্ঘন করিবেন না বুঝিতে পারিয়া কুন্তী ও মহর্ষি ব্যাসদেবের কথায়, পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গেই দ্রৌপদীর বিবাহ দিলেন। ব্যবস্থা হইল, দ্রৌপদী যখন যে পাণ্ডবের গৃহে থাকিবেন, তখন সে পাণ্ডব ভিন্ন অন্য পাণ্ডবের সে গৃহে প্রবেশের অধিকার থাকিবে না। যদি কেহ এই নিয়ম ভঙ্গ করেন, তবে তাঁহাকে বারোবৎসর বনবাসে থাকিতে হইবে।

(২)

বিবাহের পর পাণ্ডবগণের গুপ্তবাসের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইল। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডবগণকে আনাইয়া রাজ্যের অর্দ্ধাংশ তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া যুধিষ্ঠির রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

একদিন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর গৃহে ছিলেন, বিশেষ রাজকার্য্যের অনুরোধে অর্জ্জুনকে সেখানে উপস্থিত হইতে হইল। নিয়ম ভঙ্গ হওয়ায় অর্জ্জুন বারোবৎসরের জন্য বনবাসে প্রস্থান করিলেন।

এই সময় অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণের ভগ্নী সুভদ্রাকে বিবাহ করেন। বারোবৎসর গত হইলে, সুভদ্রাকে লইয়া অর্জ্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিলেন। সুভদ্রা দ্রৌপদীর নিকটে গিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"আজ হইতে আমি তোমার দাসী হইলাম।" দ্রৌপদী সস্নেহে সুভদ্রাকে আলিঙ্গন করিয়া পরিহাসচ্ছলে কহিলেন,—"তোমার স্বামী নিঃসপত্ন হউন।" (অর্থাৎ, তোমার স্বামীর যেন এক ভিন্ন দ্বিতীয় পত্নী না থাকে)—সুভদ্রাও হাসিয়া দ্রৌপদীর দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"আচ্ছা তাহাই হউক।"

ইহার পর হইতে চিরজীবন দুইজনে এমন দৃঢ় প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, যে, কেহই তাঁহাদিগকে পরস্পর সপত্নী বলিয়া মনে করিতে পারিত না।

(৩)

কিছুকাল পরে, কৌরবগণ, পণে পাশা খেলিবার জন্য হস্তিনাপুরে যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিল। পরম ধর্ম্মাত্মা হইয়াও

পাশা খেলিবার সময় যুধিষ্ঠির একেবারে মত্ত হইতেন। দুর্যোধনের মাতুল শকুনি অতি ভাল পাশা খেলিত। খেলার মধ্যে ফাঁকি প্রবঞ্চনাতেও সে খুব সিদ্ধহস্ত ছিল। তাহার কুটিল প্রবঞ্চনায় যুধিষ্ঠির খেলায় হারিতে লাগিলেন। ধন রত্ন রাজ্য, দাস দাসী যাহা কিছু ছিল সমস্ত যুধিষ্ঠির পণে হারিলেন। শেষে ক্রমে-ক্রমে চা'র ভাইকে এবং নিজেকে পর্য্যন্ত পণ রাখিয়া খেলায় হারিয়া—কৌরবগণের দাস হইলেন। হারিতে হারিতে যুধিষ্ঠিরের মত্ততা এত বাড়িল, যে, শেষ দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত পণে হারিলেন।

স্বামীর বুদ্ধির দোষে দ্রৌপদী এখন দুষ্ট কৌরবগণের দাসী। পাপিষ্ঠ দুর্যোধন এখন দ্রৌপদীর উপর যথেচ্ছ ব্যবহারের অধিকারী। ক্রূরমতি দুর্যোধন চিরদিনই পাণ্ডবগণকে ঈর্ষ্যা করিত, পাণ্ডবগণের লাঞ্ছনা ও অনিষ্ট সাধন অপেক্ষা তাহার প্রিয়কার্য্য আর কিছুই ছিল না। যে জন্য সে ধর্ম্মপ্রাণ পাণ্ডব-গণকে পাশা খেলিতে আহ্বান করিয়াছিল, সে বাসনা তা'র পূর্ণ হইয়াছে। বীরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ আজ তা'র পণে জিত দাস। ইহাতেও তার পাপ-আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হইল না। পণে জিতা দাসী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনিয়া সকলের সম্মুখে অবমাননা করিয়া লাঞ্ছিত পাণ্ডবগণকে আরও দারুণ লাঞ্ছনা দিবার জন্য,—তাহাদের ব্যথিত প্রাণে আরও দারুণ ব্যথা দিবার জন্য, তাহার প্রবল বাসনা হইল।

পাপিষ্ঠ, দ্রৌপদীকে সভায় আনিবার জন্য খুল্লতাত বিদুরকে আদেশ করিল। ধর্ম্মাত্মা বিদুর সরোষে দুর্যোধনকে তীব্র

ভৎর্সনা করিয়া তা'র আদেশ অবজ্ঞা করিলেন। তখন সভাস্থ প্রতিকামীকে দুর্যোধন দ্রৌপদীকে আনিবার জন্য পাঠাইল।

পূর্ব্বকালে পণরক্ষা ও প্রতিজ্ঞাপালন ক্ষত্রিয়বীরগণের অবশ্য-পালনীয় ধর্ম্ম বলিয়া সকলে মনে করিতেন। এ ধর্ম্মপালনের জন্য মরণের অধিক যন্ত্রণাও তাঁহারা নীরবে সহ্য করিতেন। তাই পাণ্ডবগণ নীরবে এই অসহনীয় অত্যাচার সহ্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। তাই, মহাতেজস্বী বীরকুলশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য প্রভৃতি সভায় উপস্থিত থাকিয়াও, ইহার কোন প্রতিকারচেষ্টা করিলেন না। তাঁহারা ভাবিলেন, যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণে হারিয়াছেন, দ্রৌপদী এখন সর্ব্বথা দুর্যোধনের অধিকারে। তিনি তাঁহার উপর যেরূপ ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন। পুত্রস্নেহে দুর্ব্বল, পুত্রভয়ে ভীত ধৃতরাষ্ট্রের নিকট হইতেও কোনরূপ প্রতি-কারের আশা ছিল না।

প্রতিকামী দ্রৌপদীর নিকট উপস্থিত হইয়া, সকল ঘটনা তাহাকে বলিল। শুনিয়া দ্রৌপদী বড় বিস্মিতা হইয়া, কহিলেন,—"প্রতিকামি, তুমি কি পাগল হইয়াছ? স্ত্রীপণ করিয়া কে কবে পাশা খেলিয়া থাকে? যদি সত্য হয়, যুধিষ্ঠিরও তবে পাগল হইয়াছেন। তাঁ'র কি পণ রাখিবার আর কিছু ছিল না?"

প্রতিকামী আবার সমস্ত ঘটনা বিশেষরূপে বিবৃত করিল। দ্রৌপদী প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু দুর্ব্বলচিত্ত রমণীর ন্যায় তিনি ভীত বা অস্থির হইলেন না। মনে মনে দুর্যোধনের হস্ত হইতে ধর্ম্মরক্ষার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ছল ভিন্ন উদ্ধারের আর উপায় নাই; বুদ্ধিমতী, যুধিষ্ঠিরের পণে এক সূক্ষ্ম ছল বাহির করিলেন।

যুধিষ্ঠির আগে তাঁহাকে, কি, নিজেকে পণ রাখিয়াছিলেন? যদি তিনি আগে দাসরূপে দুর্যোধনের অধিকৃত হইয়া থাকেন, তবে পরদাস পরাধিকৃত, তাঁহার দ্রৌপদীর উপর কোন অধিকার নাই। সুতরাং কেমন করিয়া তিনি দ্রৌপদীকে পণ রাখিতে পারেন? বিশেষতঃ দ্রৌপদী একা তাঁ'র স্ত্রী ন'ন, পঞ্চভ্রাতা সকলেরই সমান স্ত্রী। এই চিন্তা করিয়া, দ্রৌপদী, প্রতিকামিকে কহিলেন,—"প্রতিকামি, তুমি আগে যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে আমার এই প্রশ্নের উত্তর লইয়া আইস, তা'র পরে প্রয়োজন হইলে আমি যাইব।—যুধিষ্ঠির আগে আমাকে, কি, নিজেকে পণে হারিয়াছেন? তিনি স্বাধীন ভাবে কোন ধনের অধিকারী অবস্থায়, কি, পরাধীন পরাধিকৃত অবস্থায় আমাকে পণ রাখিয়াছিলেন?"

প্রতিকামি সভায় গিয়া দ্রৌপদীর প্রশ্ন যুধিষ্ঠিরকে জানাইল। প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিয়া যুধিষ্ঠির নীরবে রহিলেন। দুর্যোধন কহিল,—"দ্রৌপদীর যদি কোন প্রশ্ন থাকে, এখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করুক।"

প্রতিকামি আবার দ্রৌপদীর নিকট গেল। দ্রৌপদী কহিলেন,—"ধর্ম্মবিধান যাহা, তাহা আমাদের সকলকেই পালন করিতে হইবে। কুরুবংশীয়েরাও কখনও ধর্ম্মবিধান লঙ্ঘন করিবেন না। প্রতিকামি, তুমি আবার যাও। সভাস্থ সকলকে

জিজ্ঞাসা কর, এ অবস্থায় ধর্ম্মতঃ আমার কি কর্ত্তব্য। তাঁহারা যাহা আদেশ করিবেন, আমি তা'ই করিব।"

প্রতিকামি সভ্যগণ-সমীপে দ্রৌপদীর প্রশ্ন নিবেদন করিল।—এ কঠিন প্রশ্নের উত্তর কেহই স্থির করিতে পারিলেন না। যুধিষ্ঠির দাসত্ব গ্রহণে সকল অধিকার হারাইয়াছেন এ কথাও সত্য। আর স্ত্রীও সকল অবস্থায় স্বামীর অনুবর্ত্তিনী, ইহাও শাস্ত্রবিধান। প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিয়া, সভাস্থ সকলে নীরব রহিলেন।

বারবার দ্রৌপদী তাঁহার আদেশ অবজ্ঞা করায় দুর্যোধন বড় রাগিয়া চুলে ধরিয়া দ্রৌপদীকে সভায় আনিতে দুঃশাসনকে আদেশ করিল। দুঃশাসন দুর্য্যোধনের যোগ্য ভাই। সে অমনি ছুটিল। দ্রৌপদীর ক্রোধ, অনুরোধ, মিনতি কিছুতেই কর্ণপাত না করিয়া, পাপিষ্ঠ, কেশাকর্ষণে একবস্ত্রা রজঃস্বলা দ্রৌপদীকে টানিয়া গুরুজন ও বিভিন্নদেশীয় রাজগণে পূর্ণ সভার মধ্যে লইয়া আসিল। সকলের সমক্ষে আপনাকে এইরূপ বিধ্বস্তা ও অবমানিতা দেখিয়া ক্রোধভরে দ্রৌপদী কহিলেন,—"কি!—আজ শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের সমক্ষে, কুরুবংশীয় বীরগণের সমক্ষে আমার এই লাঞ্ছনা! অথচ সকলে নীরবে ইহার অনুমোদন করিতেছেন? কেহই লাঞ্ছিতা কুলবধূর মানরক্ষার জন্য একটি কথাও বলিতেছেন না? আজ সকলেই কি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হারাইয়াছেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর কাহারও মধ্যে কি একটু মনুষ্যত্ব নাই? কি করিয়া তাঁহারা আজ এই অধর্ম্ম চক্ষে দেখিতেছেন?"—

—এই বলিয়া দ্রৌপদী রোষোদ্দীপ্ত নয়নে পাণ্ডবগণের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিলেন। সেই কটাক্ষের তীব্র জ্বালাময় বিষ পাণ্ডবগণের অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহারা পণেবদ্ধ ক্ষত্রিয়সন্তান, নীরবে এই মর্ম্মান্তিক যাতনা সহ্য করিতে লাগিলেন।

ভীষ্ম কহিলেন,—"পাঞ্চালি, পরবশ ব্যক্তি পরের ধন পণ রাখিতে পারে না; এদিকে স্ত্রীও স্বামীর অধীন; সুতরাং তোমার প্রশ্নের উত্তর করা বড়ই কঠিন। তা'রপর, ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির স্ব-ইচ্ছায় আসিয়া পাশা খেলায় পণে তোমাকে হারিয়াছেন তিনি তোমার স্বামী। পণে বদ্ধ বলিয়া তোমার এত লাঞ্ছনা দেখিয়াও তিনি নীরবে আছেন। এ অবস্থায় আমাদের মতামত কি প্রকারে আমরা ব্যক্ত করিতে পারি?"

দ্রৌপদী কহিলেন,—"যুধিষ্ঠির স্ব-ইচ্ছায় কখনও পাশা খেলিতে আসেন নাই। কূটবুদ্ধি, পাপিষ্ঠ কৌরবগণের নিমন্ত্রণে বাধ্য হইয়া—পাশা খেলিয়াছেন। কপট খেলায় তিনি হারিয়াছেন। যা'ই হ'ক, সভামধ্যে কুরুবংশীয় প্রধান ব্যক্তিরা সকলেই আছেন, আপনারা বিবেচনা করিয়া আমার প্রশ্নের উত্তর দিন্। আপনাদের বিধানে যাহা ধার্য্য হইবে, আমি তাহাতেই বাধ্য হইব।"

কিন্তু কেহই এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ প্রভৃতি দ্রৌপদীকে নানারূপ কটুবাক্যে ও বিদ্রূপে ব্যথিত ও অবমানিত করিতে লাগিল। দুর্যোধনের আদেশে

দুঃশাসন দ্রৌপদীকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য আকর্ষণ করিতে উদ্যত হইল। দ্রৌপদী সক্রোধে কহিলেন,—"পাপিষ্ঠ! আমাকে স্পর্শ করিস্ না! জানিস্—এখনও আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পাই নাই। যতক্ষণ আমি প্রশ্নের উত্তর না পাই,—ততক্ষণ আমার উপর তোদের কোনই অধিকার নাই।" কিন্তু দুরাত্মা দুঃশাসন শুনিল না, সে দ্রৌপদীকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

তখন, সভাস্থ রাজগণ ও অন্যান্য সকলকে লক্ষ্য করিয়া দ্রৌপদী কহিলেন,—"আমি সতী নারী—যুধিষ্ঠিরের সবর্ণা ভার্য্যা, দ্রুপদরাজার কন্যা, শ্রীকৃষ্ণের সখী।—আজ অনাথার ন্যায় এই সভায় সকলের সমক্ষে এইরূপ লাঞ্ছিত হইতেছি। রাজগণ, আজ আপনাদের রাজধর্ম্ম কোথায়? কুরুবংশীয়গণ, কোথায় আজ আপনাদের কুলধর্ম্ম? কেহই কি আপনারা আজ আমার এই নিদারুণ লাঞ্ছনার প্রতিকার করিতে পারেন না? যদি না পারেন,—এতটুকু সাহসও কি কাহারও নাই, যে, আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন? বীরপতির সমক্ষে, মহাত্মা শ্বশুরগণের সমক্ষে, ভারতের রাজগণের সমক্ষে সভামধ্যে লাঞ্ছিতা কুরুকুল-বধূ আমি আপনাদের নিকট আবার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, বলুন, আমি ধর্ম্মতঃ জিত হইয়াছি কি না? বলুন, পরবশ দাস-রূপে যুধিষ্ঠিরের আমাকে পণে রাখার অধিকার আছে কি না? আপনারা যাহা বলিবেন,—আমি তাহাতেই প্রস্তুত আছি।"

আর কেহ কোন উত্তর করিলেন না। একমাত্র ভীষ্ম কহিলেন,—"আমরা কেহই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ নই।

তুমি জিতা কি অজিতা, এ সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির যাহা স্থির করিয়া বলিবেন, তাহাই প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে।”

যুধিষ্ঠির কিছুই কহিলেন না। নির্লজ্জ কৌরবগণের বিদ্রূপ ও পরিহাস ক্রমে অসহনীয় হইয়া উঠিল। পাণ্ডবদের যা' কিছু ধন, সকলই কৌরবগণের প্রাপ্য— এই ছল করিয়া তাহারা পাণ্ডবগণের সমস্ত আভরণ, এমন কি, উত্তরীয় বসন পর্য্যন্ত গ্রহণ করিল। দুঃশাসন দ্রৌপদীর বসন উন্মোচনে পর্য্যন্ত উদ্যত হইল। নিরুপায় দ্রৌপদী লজ্জারক্ষার জন্য শেষে লজ্জানিবারণ মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। কাতরবচনে তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে দ্রৌপদীর লজ্জারক্ষা হইল। দুঃশাসন যত টানিতে লাগিল, দ্রৌপদীর বসন তত বাড়িতে লাগিল। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া দুঃশাসন সতীলক্ষ্মীকে সভামধ্যে বিবস্ত্রা করিবার পাপ-বাসনা ত্যাগ করিল।

এই সময় দুর্যোধন দ্রৌপদীকে স্বীয় বাম উরু প্রদর্শন করাইল। মহাতেজস্বী ভীমসেনের আর সহ্য হইল না। তিনি সেই সভামধ্যে প্রতিজ্ঞা করিলেন, দুঃশাসনের বক্ষ চিরিয়া রক্ত পান করিবেন,—গদাঘাতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করিবেন। কিন্তু পণে বদ্ধ জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার ধর্ম্মহানির ভয়ে, সামর্থ্যসত্ত্বেও তখন পাপিষ্ঠদের উপযুক্ত শাস্তিবিধানে ভীম বিরত রহিলেন। কথিত আছে, ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া দ্রৌপদীও প্রতিজ্ঞা করেন, —“চুলে ধরিয়া দুঃশাসন তাঁ'কে সভায় আনিয়া যে অপমান

করিয়াছে, তা'র প্রতিশোধ স্বরূপ ভীমসেন যেদিন দুঃশাসনের বুকের রক্ত পান করিয়া সেই রক্ত মাখা হাতে তাঁ'র চুল বাঁধিয়া দিবেন, সেই দিন তিনি চুল বাঁধিবেন; তা'র পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই অপমান স্মরণ করিয়া তিনি খোলা চুলে থাকিবেন।

ক্রমে সভামধ্যে দ্রৌপদীর এই লাঞ্ছনার কথা অন্তঃপুরে পৌঁছিল। গান্ধারী দেবী তৎক্ষণাৎ সভায় আসিয়া—ইহার প্রতিকার করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে তিরস্কার করিয়া—দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন,—"মা, যাহা হইয়াছে সকল ক্ষমা কর। তোমাকে আর কেহ অপমান করিতে পারিবে না। তোমার তেজস্বিতায় এবং ধর্ম্মপরায়ণতায় আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি আমার নিকট ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর।"

দ্রৌপদী কহিলেন,—"আর্য্য, যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে যুধিষ্ঠিরের দাসত্বমুক্তির বর আমাকে দান করুন।"

ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠিরের দাসত্বমোচন করিয়া দ্রৌপদীকে দ্বিতীয় বর চাহিতে বলিলেন। দ্রৌপদী, ভীম-অর্জ্জুন ও নকুল সহদেবের দাসত্বমুক্তি প্রার্থনা করিলেন। পাণ্ডবগণের দাসত্ব মোচন করিয়া ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীকে আবার বর দিতে চাহিলেন। তখন দ্রৌপদী কহিলেন,—"আর্য্য, অতি লোভীর ধর্ম্মনাশ হয়। আমি আর বর চাহি না। বিশেষতঃ, ধর্ম্মবিধান অনুসারে ক্ষত্রিয়-পত্নীর দুই বরের বেসি বর প্রার্থনা করা অসঙ্গত। আমার স্বামীরা দাসত্বমুক্ত হইয়াছেন, ধর্ম্মবলে ও বাহুবলে তাঁহারা সবই

এখন লাভ করিতে পারিবেন। আমার আর বরের প্রয়োজনও নাই।”

ধৃতরাষ্ট্র তখন পাণ্ডবগণকে তাঁহাদের পণে জিত রাজ্যধন সকলই ফিরাইয়া দিয়া মিষ্টবাক্যে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠাইলেন।

দুর্যোধন ও তাহার বন্ধুগণ ইহাতে যা'র-পর-নাই ক্ষুণ্ণ হইল। বনবাস পণ করিয়া—আবার পাশা খেলিবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিতে তাহারা ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করিল। ধৃতরাষ্ট্রের নিমন্ত্রণে যুধিষ্ঠির আবার পাশা খেলিতে আসিলেন। বারো বৎসর ভ্রাতৃগণসহ বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস, এই পণে যুধিষ্ঠির পাশাখেলায় হারিয়া, তের বৎসরের জন্য নির্ব্বাসিত হইলেন। কুন্তীদেবীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া দ্রৌপদীও তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন।

(৪)

প্রশান্ত ও নিশ্চিন্ত মনে যুধিষ্ঠির বনে বাস করিতেছেন। যে দুষ্ট শত্রুর কুটিল চক্রান্তে তিনি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী সহ বনে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহাদের প্রতি ক্রোধ বা প্রতিহিংসার ভাব কখনো তাঁহার মনে উদয় হয় না। কখনো যে এই লাঞ্ছনা এই অত্যাচারের প্রতিশোধ বা প্রতিকার হইবে, যুধিষ্ঠিরের অবস্থা দেখিয়া তাহা বোধ হয় না। দ্রৌপদীর ইহা সহ্য হইল না। যুধিষ্ঠিরকে উত্তেজিত করিবার জন্য তিনি একদিন কহিলেন,—“মহারাজ, তুমি রাজা, তোমার ভ্রাতারা

রাজকুমার, আমিও রাজকন্যা—রাজমহিষী। আজ, কেন আমরা বনে পর্ণকুটীরে এত কষ্ট পাইতেছি? আমরা ধর্ম্ম-লঙ্ঘন করি নাই, কেবল কৌরবগণের অকারণ শত্রুতায়,—তাহাদের কুটিল চক্রান্তে প্রতারিত হইয়া আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা। কেন আজ তোমার মনে সেই শত্রুর প্রতি ক্রোধের সঞ্চার হয় না? লোকে বলে, "তেজোহীন ক্রোধহীন ক্ষত্রিয় হয় না; আজ কেবল তোমাতে তা'র ব্যতিক্রম দেখিতেছি। তেজই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম, তেজোহীন ক্ষত্রিয় চিরদিন শত্রুর নিকট লাঞ্ছিত ও অবমানিত হয়। জগতে সে কখনো প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবে না; নিতান্ত হীন হইয়া অধম দাসের ন্যায় তাহাকে জীবন বহন করিতে হয়।

তাই বলিয়া ক্ষমাগুণের আমি নিন্দা করিতেছি না। মানবের মানবত্ব রক্ষা করিতে হইলে, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে, অবস্থাবিশেষে ক্ষমা এবং অবস্থাবিশেষে ক্রোধ ও তেজ উভয়েরই ব্যবহার প্রয়োজন। উপকারী ব্যক্তি কোন অপরাধ করিলে, তাহাকে ক্ষমা করিতে হয়। না জানিয়া কেহ কোন অপরাধ করিলে, তাহাও ক্ষমা করিতে হয়। ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহ কোন অপরাধ করিলে, দুই একবার তাহাকে ক্ষমা করা যাইতে পারে। কিন্তু, কুটিলচরিত্র গর্ব্বিত শত্রু বার বার যদি কাহাকেও নির্যাতন করে, তাহাকে ক্ষমা করা কেবল তাহার দুষ্ট চরিত্রের প্রশ্রয় দেওয়া মাত্র। বিশেষ, যে ক্ষত্রিয়, যে রাজা, যাহাকে লোকশাসন ও লোকপালন করিতে হইবে, কেবল

ক্ষমা কখনো তাহাকে শোভা পায় না। দুষ্টের শাসনে যদি সে ক্রোধ ও তেজ প্রকাশ না করে, কি প্রকারে সে লোকরক্ষা করিয়া রাজধর্ম্ম পালন করিবে?"

পরে, যুধিষ্ঠিরের বৈরাগ্য ও নিশ্চেষ্টতা লক্ষ্য করিয়া দ্রৌপদী আবার কহিলেন,—"পৃথিবীতে কর্ম্ম-সাধনই পুরুষের পুরুষত্ব। নিশ্চেষ্ট পুরুষ জগতে কখনো উন্নতিলাভ করিতে পারে না। দৈব যতই বলবান্ হউন, পুরুষকারই পুরুষের প্রধান অবলম্বনীয়। একমাত্র দৈবের উপর নির্ভর করিয়া—কে কবে জগতে আপনার মহত্ত্বের গৌরব দেখাইতে পারিয়াছে? কর্ম্মই জীবন, কর্ম্মই সুখের মূল,—কর্ম্মই পৃথিবীতে মানুষের প্রধান ধর্ম্ম। কর্ম্ম মানুষকে করিতেই হইবে। কর্ম্মহীন যা'র জীবন, সে জড়-পদার্থের ন্যায় অসার। জলের মধ্যে কাঁচা ঘটের মত কর্ম্মহীন উদ্যমহীন মানুষের জীবন সংসারে নষ্ট হয়। কর্ম্ম সফল কি নিষ্ফল হইবে, ইহাও কাহারও চিন্তা করা উচিত নয়। সফলই হউক আর নিষ্ফলই হউক, কর্ম্মাধীন মানুষ সর্ব্বদা কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবে। সর্ব্বপ্রযত্নে যে কর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকে, কর্ম্মের নিষ্ফলতার জন্য তাহাকে কখনো দোষ দেওয়া যায় না। নিষ্ফল হইলেও এই তাহার সান্ত্বনা, যে, সে কর্ত্তব্যে কখনো অবহেলা করে নাই। তাই বলিতেছি মহারাজ, প্রতিশোধের জন্য ক্ষত্রিয়-তেজে তুমি উদ্দীপিত হও। এরূপ প্রশান্ত নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকিও না। ক্ষত্রিয়রূপে,—রাজারূপে তোমার যোগ্য কর্ম্মে আপনি উদ্যমশীল হও। নতুবা চিরদিন এইরূপ হীন ও অসার

জীবন বহিতে হইবে। তোমার ভ্রাতৃগণের দেবতাতীত বলবীর্য্য সকলই নিষ্ফল হইবে।”

কিন্তু, শান্ত প্রকৃতি অমানুষিক ক্ষমাশীল যুধিষ্ঠিরের প্রাণে ক্রোধের উত্তেজনা করা দ্রৌপদীর মত তেজস্বিনী নারীরও অসাধ্য!

(৫)

বনবাস কালে একদিন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মহিষী সত্যভামা সহ পাণ্ডবগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। সত্যভামার সঙ্গে দ্রৌপদীর বিশেষ সখ্যভাব ছিল। দুই সখী নির্জ্জনে বসিয়া আলাপ করিতেছেন। অন্যান্য কথার পর সত্যভামা দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“সখি, তোমার সিংহের মত মহাতেজস্বী পাঁচ স্বামী। অথচ সকলেই তোমার বশীভূত। তুমি কি কোন মন্ত্র জান, না, ঔষধ করিয়াছ? আমাকে বলিতে পার, কি করিলে কৃষ্ণ আমার এইরূপ বশীভূত হইবেন?”

দ্রৌপদী হাসিয়া কহিলেন,—‘সখি, মন্ত্র ঔষধে কি স্বামী বশ করা যায়! যা’দের কোন গুণ নাই, তাহারাই মন্ত্র ও ঔষধে স্বামী বশ করিতে গিয়া অনর্থক স্বামীর অনেক অনিষ্ট করিয়া ফেলে। স্বামীরা কেন আমার বশীভূত, বলিতেছি, শোন।— স্বামীই স্ত্রীলোকের দেবতা ও একমাত্র গতি জানিয়া আমি কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা স্বামীর সেবাই করিয়া থাকি। স্বামী-সেবাই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত—একমাত্র ধর্ম্ম। আমি কখনো তাঁহাদিগকে কটু কথা বলি না, অভিমান করিয়া তাঁহাদের মনে ব্যথা দিই না। তাঁহাদের স্নানাহার না হইলে স্নানাহার করি

না। তাঁহারা না বসিলে বসি না, না শুইলে শুই না। যে দ্রব্য তাঁহারা ভালবাসেন না, আমিও তাহা পরিত্যাগ করি। যে লোকের সঙ্গে আলাপ করা তাঁহারা ইচ্ছা করেন না, সেরূপ লোকের সঙ্গে কখনো আলাপ করি না। স্বামীর প্রিয়পাত্র যে, সে আমার অপ্রিয় হইলেও, তাহাকে শ্রদ্ধা করি, যত্নপূর্ব্বক তাহার সেবা করি। বাহিরের কার্য্যে শ্রান্ত হইয়া তাঁহারা গৃহে আসিলে আসন ও জল দিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের শ্রান্তি দূর করি। বাহিরে তাঁহাদের কণ্ঠস্বর শুনিলেই উঠিয়া দ্বারের সম্মুখে গিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করি। দাসীর নিকট তাঁহারা কোন দ্রব্য চাহিলে, আমি নিজে উঠিয়া সেই দ্রব্য তাঁহাদিগকে আনিয়া দিই। যখন রাণী ছিলাম, রাজ-সংসারের ভার, পোষ্যবর্গের ভার, তাঁহারা আমার হাতে দিয়াছিলেন। আমি প্রত্যহ নিজের হাতে গৃহ-মার্জ্জন করিয়া, পাক করিয়া যথাসময়ে সকলকে আহার করাইতাম। ধান্য ও গৃহের অন্যান্য সমুদয় দ্রব্য নিজে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতাম। নিজে, অন্তপুরের ভৃত্য ও গোপাল, মেষপালের তত্ত্বাবধান করিতাম। নিজে সংসারের আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিতাম। রাজপুরীর বৃহৎ পোষ্যবর্গের সেবায় আমার রাত্রি-দিন জ্ঞান ছিল না। প্রত্যহ সকলে খাইলে আমি খাইতাম, সকলে শুইলে আমি শুইতাম। আবার প্রত্যূষে সকলের আগেই আমি শয্যা ত্যাগ করিয়া গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতাম।

শ্বশ্রূদেবী কুন্তীকে প্রত্যহ নিজে আহারাদি করাইয়া সেবা করিতাম। কোন কার্য্যে তাঁ'র উপরে আমার কর্তৃত্ব দেখাইতাম

না। তাঁহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বসন ভূষণ কখনও ব্যবহার করিতাম না। গৃহধর্ম্মে ও পাল-পার্ব্বণে সর্ব্বথা তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইয়া চলিতাম। এদিকে সপত্নীদিগকে নিজের সহোদরার মত জ্ঞান করিতাম। কখনো তাঁহাদের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিতাম না, বা, কোনরূপ অনিষ্টাচরণে বা কটুবাক্যে তাঁহাদিগকে ব্যথা দিতাম না।

সখি, স্বামী বশ করিবার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই। ইহাই স্বামী-বশের মন্ত্র ও ঔষধ। এই মন্ত্র, এই ঔষধ ব্যবহার কর, দেখিবে, শ্রীকৃষ্ণ একান্ত মনে তোমারি বশীভূত হইবেন।

(৬)

ইহার কিছুকাল পরে পাণ্ডবগণ কাম্যক বনে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহারা আহার অন্বেষণে দূরে গমন করিয়াছেন, দ্রৌপদী একাকিনী গৃহে আছেন, এমন সময় দুর্য্যোধনের ভগিনী দুঃশলার স্বামী সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সেখানে উপস্থিত হইলেন। দ্রৌপদীর রূপে মুগ্ধ হইয়া জয়দ্রথ তাঁহাকে হরণ করিবার অভিলাষ করিল। প্রথমে দ্রৌপদীকে তাহার সঙ্গে যাইবার জন্য অনেক অনুনয় করিল। অবশ্য, যোগ্যবাকে দ্রৌপদী তাহার পাপ প্রার্থনার উত্তর প্রদান করিলেন। তখন জয়দ্রথ বলপূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল। তেজস্বিনী সতী, পদাঘাতে জয়দ্রথকে মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু হাজার হইলেও তিনি স্ত্রীলোক, আর জয়দ্রথ বীরপুরুষ। মাটি

হইতে উঠিয়া ক্রোধে জয়দ্রথ সবলে দ্রৌপদীকে রথে তুলিয়া নিয়া চলিল।

দ্রৌপদী ভীত হইয়া রোদন করিলেন না। ক্রোধ-দীপ্তনয়নে পাণ্ডবগণের আগমন আশায় পথের দিকে চাহিতে লাগিলেন। অবিলম্বে দূরে পাণ্ডবগণের হুঙ্কার শোনা গেল। সগর্ব্বে দ্রৌপদী অদূরে আগত পাণ্ডবগণকে দেখাইয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের পরিচয় জয়দ্রথকে দিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ, জয়দ্রথের সৈন্যগণকে বিধ্বস্ত করিয়া যখন তাঁহার রথের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন ভীত জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে রথ হইতে নামাইয়া দ্রুত পলায়ন করিল। কিন্তু দ্রুতগমনে ভীম ও অর্জ্জুন তাহাকে ধরিয়া আনিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত করিলেন। জয়দ্রথ যুধিষ্ঠিরের পদতলে পড়িয়া দাসত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তখন দ্রৌপদী কহিলেন,—"দুর্ব্বৃত্ত যখন তোমাদের পদানত হইয়া দাসত্ব স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে, তখন প্রাণনাশ না করিয়া ইহাকে বিদায় করিয়া দাও।" দ্রৌপদীর অনুরোধে মুক্ত হইয়া জয়দ্রথ প্রস্থান করিল।

(৭)

ক্রমে পাণ্ডবগণের বনবাসের বারোবৎসর পূর্ণ হইল, এখন একবৎসরের জন্য অজ্ঞাত বাসের সময় আসিল। ভিন্ন ভিন্ন ছদ্মবেশে তাঁহারা সকলেই বিরাট রাজার গৃহে বাস করিবেন, এই স্থির হইল। সেকালের রাজারা সকলেই পাশা খেলিতে

বড় ভাল বাসিতেন। যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় অভিজ্ঞ কঙ্ক নামক কোন ব্রাহ্মণরূপে বিরাট রাজার ক্রীড়াসহচর হইলেন। মহাবল ও মহাকায় ভীমসেনের অল্প আহারে চলিত না, এবং তিনি রন্ধনেও পটু ছিলেন, তিনি বল্লব নামক পাচকরূপে বিরাটরাজার রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। অর্জ্জুন কোন দৈবশক্তিবলে নপুংসক রূপ ধরিতে পারিতেন। নৃত্যগীতেও তিনি নিপুণ ছিলেন। অর্জ্জুন নপুংসক রূপ ধরিয়া চুল বাঁধিয়া, শাঁখা-বলয় ও সাড়ী পরিয়া বৃহন্নলা নামে বিরাটরাজের কন্যাদের নৃত্যগীত শিক্ষাদানে নিযুক্ত হইলেন। * নকুল বিরাট-রাজের অশ্বপাল এবং সহদেব গো-পাল হইলেন। পূর্ব্বকালে রাজা এবং ধনীদের গৃহে সৈরিন্ধ্রী নামে উচ্চশ্রেণীর একরূপ পরিচারিকা থাকিত। ইহারা রাণী ও রাজকন্যা এবং ধনীগৃহিণীদের চুল বাঁধিত, মালা গাঁথিত, গায়ে গন্ধ মাখাইত, অলঙ্কার পরাইত এবং অন্যান্য মনোরম শিল্পকার্য্য করিত। দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রীরূপে বিরাট-রাজ-মহিষী সুদেষ্ণার সেবায় নিযুক্ত হইবার প্রার্থনা করিলেন। দ্রৌপদীর রূপ দেখিয়া এমন পরিচারিকা রাখিতে সুদেষ্ণার সাহস হইল না। তিনি কহিলেন,—"বাছা, তোমাকে রাখিতে আমার সাহস হয় না। তোমার যে রূপ,—শেষে তোমাকে রাখিয়া কি নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিব ?"

* একালেও এইরূপ, নপুংসকেরা স্ত্রীলোকের বেশ পরিয়া নৃত্যগীত করে, তাহাই তাহাদের উপজীবিকা। চলিত কথায় ইহাদিগকে 'হিজ্‌ড়া" বলে।

দ্রৌপদী কহিলেন,—"মা, তোমার কোন ভয় নাই। আমি অন্য পুরুষের দিকে কখনো দৃষ্টিপাত করি না। পাঁচজন বলিষ্ঠ গন্ধর্ব্বযুবক আমার স্বামী। তাঁহারা প্রচ্ছন্ন ভাবে সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করেন। কু-অভিলাষে কেহ আমাকে কোন কথা বলিলে, তৎক্ষণাৎ তাঁহারা তাহার শাস্তি বিধান করেন। আমাকে যত্ন করিয়া কেহ রাখিলে গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার অনেক উপকার করেন। তোমার কোন ভয় নাই মা, আমাকে আশ্রয় দান কর।" সুদেষ্ণা আর আপত্তি না করিয়া, দ্রৌপদীকে সৈরিন্ধ্রীরূপে নিজ সেবায় নিযুক্ত করিলেন।

বিরাটরাজ নিজে বড় শক্তিশালী ছিলেন না। কীচক নামে তাঁহার এক মহাবীর শ্যালক ছিল। তাহারই বিক্রমে বিরাটরাজ নিজের রাজ্য রক্ষা করিতেন। এই কীচকের চরিত্র ভাল ছিল না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? ভয়ে বিরাটরাজ কীচককে কিছু কহিতেন না। দ্রৌপদীর রূপে দুর্ব্বৃত্ত কীচক মুগ্ধ হইল। প্রথমে অনেক প্রলোভনাদি দেখাইয়াও কিছু হইল না; শেষে কীচক এক কৌশল করিল। রাণী সুদেষ্ণাকে অনুরোধ করিল, দ্রৌপদীকে কোন কৌশলে তাহার ঘরে পাঠাইয়া দেন। সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে কীচকের ঘর হইতে তাঁহার পানীয় আনিতে আদেশ করিলেন। দ্রৌপদী কীচকের ব্যবহার সুদেষ্ণার নিকট সব বলিয়া কীচকের গৃহে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সুদেষ্ণার জিদে অবশেষে তাঁহাকে যাইতে

কীচক দ্রৌপদীর প্রতীক্ষায় ছিল। দ্রৌপদী আসিবামাত্র পাপিষ্ঠ তাঁহার নিকট কুকথা উচ্চারণ করিল। ঘৃণায় দ্রৌপদী তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতেছিলেন,— পাপিষ্ঠ তাঁহার হস্ত ধারণ করিল। দৃপ্তসিংহিণীর ন্যায় গর্জ্জিয়া দ্রৌপদী বলে হাত ছাড়াইয়া নিয়া কীচককে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া দৌড়িয়া একেবারে রাজসভায় বিরাটরাজ ও কঙ্করূপী যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন।

ক্রোধে আত্মহারা হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কীচকও উপস্থিত হইয়া চুলে ধরিয়া দ্রৌপদীকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিল।

কীচকের ভয়ে ভীত বিরাটরাজ নীরবে রহিলেন। দেখিয়া, দ্রৌপদী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"মহারাজ, আপনি রাজা হইয়া নিরপরাধা অবলার এই নিগ্রহ স্বচক্ষে দেখিয়াও কোন প্রতিকার করিতেছেন না! এই কি আপনার রাজধর্ম্ম! আপনি রাজা হইয়াও দস্যুস্বরূপ। কোন্ লজ্জায় এই রাজসিংহাসনে বসিয়াছেন? সভ্যগণ! আপনাদের নিকট আমি বিচার প্রার্থনা করি। কীচক পাপিষ্ঠ, বিরাটরাজও রাজধর্ম্ম পালনে বিমুখ। যদি আপনারাও নীরবে থাকেন, তবে জানিব, অধার্ম্মিক রাজার আশ্রিত ও উপাসক বলিয়া আপনারাও ধর্ম্ম হারাইয়াছেন!"

বিরাট-সভ্যগণ ও কঙ্করূপী যুধিষ্ঠির তখন তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলেন। ক্রোধে ও অভিমানে

কাঁদিতে কাঁদিতে কাঁপিতে কাঁপিতে দ্রৌপদী অন্তঃপুরে সুদেষ্ণার নিকট উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। লজ্জিতা হইয়া সুদেষ্ণা কহিলেন,—"তাই তো, কীচক তোমাকে এমন অপমান করিয়াছে। তা তুমি যদি বল, রাজাকে কহিয়া কীচকের প্রাণদণ্ড করাইব।" অভিমানিনী দ্রৌপদী কহিলেন,—"আপনার নিকট কোন প্রতিকারের প্রার্থনা আমি করি না। দুরাত্মা আজ যাঁহাদের স্ত্রীকে অপমান করিয়াছে, সেই গন্ধর্ব্বগণই তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিবেন।"

দ্রৌপদী জানিতেন, ভীমসেন ভিন্ন এ অবমাননার প্রতিশোধের যোগ্য উত্তেজনা আর কাহারও হইবে না। সকলেই নানা বিবেচনায় ক্রোধ সংবরণ করিবেন, কেবল ভীমসেন কবিবেন না।

গভীর রাত্রিতে দ্রৌপদী ভীসেনের নিকট গমন করিলেন। ভীমসেনকে নিদ্রিত দেখিয়া দ্রৌপদীর বড় রাগ হইল। হইবারও কথা। স্ত্রীর এইরূপ অপমান দেখিয়া কোন্ তেজস্বী স্বামী এরূপ সুখে নিদ্রা যাইতে পারে? দ্রৌপদী কহিলেন,—"ছি ছি, বৃকোদর! কি সুখে নিদ্রিত আছ? তুমি জীবিত না মৃত? কোন জীবিত ব্যক্তির স্ত্রীকে এইরূপ অপমান করিয়া কি কীচক এখনও পৃথিবীতে প্রাণ লইয়া থাকিতে পারে?—"

দ্রৌপদীর স্বরে ভীমসেন জাগিয়া উঠিলেন। ভীমসেন দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু কোন সান্ত্বনায় দ্রৌপদীর মন প্রবোধ মানিল না। রোষে ও ক্ষোভে তিনি কহিতে লাগিলেন,—"আমার নিতান্ত

দুরদৃষ্ট, তাই তোমাদের মত স্বামীর স্ত্রী হইয়াও এত লাঞ্ছনা, এত অপমান সহিতেছি। তেজস্বী বীর হইয়াও তোমার স্ত্রীর এই অপমান নীরবে সহিতেছ। তোমাদিগকে আর কি বলিব? তোমাদের কি হীনতা, কি দুর্দ্দশা না চক্ষে দেখিতেছি! পাশা খেলায় সর্ব্বস্ব হারাইয়া যুধিষ্ঠির আবার সেই পাশা খেলিয়াই দিন কাটাইতেছেন। যে হাতে তুমি হিড়িম্ব, বক প্রভৃতি রাক্ষসকে বধ করিয়াছ, সেই হাতে আজ বিরাট রাজার ভাত রাঁধিতেছ। যে অর্জ্জুন বজ্রের মত কঠিন হাতে গাণ্ডীব ধরিতেন, সেই হাতে তিনি আজ শাঁখা-বলয় পরিয়াছেন। যাঁ'র হুঙ্কারে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু কাঁপিত, এখন অন্তপুরের মেয়েরা তাঁর গান শুনিয়া তৃপ্ত হইতেছে। যে পায়ের ভরে পৃথিবী কাঁপিত; সেই পায়ে তিনি বিরাট-রাজকন্যাকে নৃত্য শিখাইতেছেন। যে মাথায় উজ্জ্বল কীরিট শোভা পাইত, সেই মাথায় তিনি খোঁপা বাঁধিয়াছেন। নিতান্ত দুরদৃষ্ট না হইলে আজ আমাকে ইহাও চক্ষে দেখিতে হয়! আমার কথা আর কি বলিব। একদিন এই পৃথিবী আমার অধিকারে ছিল, আজ আমি সুদেষ্ণার দাসী! যে হাতে এক আর্য্যা কুন্তীর গায়ে গন্ধ মাখিয়াছি, সেই হাতে আজ সুদেষ্ণার চন্দন পিষিতেছি—সুদেষ্ণার গা মাজিতেছি! যা'ই হোক, ভীম, আজিকার এ অবমাননা আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। কীচক জীবিত থাকিতে, এই রাজপুরেও আমি ধর্ম্মরক্ষা করিয়া তিষ্ঠিতে পারিব না। স্বচক্ষে সব দেখিয়াছ, সকল অবস্থা বুঝিতেও পারিতেছ। ইহার প্রতিকার কর।

অবিলম্বে কীচককে বধ কর, নতুবা বিষ ভক্ষণ করিয়া আমি মরিব। এইরূপ ঘৃণিত ও লজ্জিত জীবন ধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যু অনেক ভাল।”

আরও কি বলিতে হয়? ভীমসেন কহিলেন,—“দ্রৌপদী, আর বলিও না,—আমি কালই কীচককে সংহার করিব। তুমি কীচককে বলিও, কাল রাত্রিতে নৃত্যশালায় তুমি তা’র সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। তোমার পরিবর্ত্তে স্ত্রীবেশে আমি সেখানে থাকিব। দুরাত্মা আসিলে তাহাকে বধ করিয়া তোমাকে নিরাপদ করিব।” ভীমসেনের কথামত দ্রৌপদী কীচককে সাক্ষাতের কথা বলিলেন। সঙ্কেত মত কীচক মহা উল্লাসে রাত্রিতে নৃত্যশালায় গমন করিয়া ভীমের হস্তে নিহত হইল।

কীচকের প্রাণনাশ করিয়া ভীম তাহার হাত, পা, মুখ সমস্ত তা’র শরীরের ভিতর প্রবেশ করাইয়া কীচক্‌কে কুষ্মাণ্ড আকারে ফেলিয়া রাখিয়া নিজগৃহে গমন করিলেন। প্রভাতে সকলে কীচকের মৃতদেহ দেখিয়া বিস্মিত হইল। কেহ জানিল না, কে কীচককে মারিয়া তাহার মৃতদেহের এই দুর্দ্দশা করিয়া রাখিয়াছে। দ্রৌপদী সকলকে কহিলেন, তাঁহাকে অবমাননা করায় তাঁহার গন্ধর্ব্বস্বামীরা কীচকের এই দুর্দ্দশা করিয়াছেন।

কীচকের একশত পাঁচ ভাই ছিল। তাহাদিগকে লোকে উপকীচক বলিত। কীচকের মৃত্যুতে উপকীচকেরা বড় রাগিয়া কীচকের মৃতদেহের সঙ্গে দগ্ধ করিবার জন্য দ্রৌপদীকেও বাঁধিয়া লইয়া চলিল। ভীম আপন বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন;

গন্ধর্ব্ববেশে উপকীচকগণকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে সংহার করিলেন। মুক্ত হইয়া দ্রৌপদী রাজগৃহে ফিরিলেন।

দ্রৌপদী যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন, তখন অর্জ্জুন নৃত্য-শালায় রাজকন্যাদিগকে নৃত্য শিক্ষা দিতেছিলেন। দ্রৌপদীকে দেখিয়া অর্জ্জুন হাস্যমুখে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া উপকীচকগণের বধের বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলেন। শ্লেষবাক্যে দ্রৌপদী কহিলেন,—"বৃহন্নলা, তুমি নাচ গান করিতেছ, কর। সৈরিন্ধ্রীর কথায় তোমার কাজ কি? আমার যে দুঃখ, তা' তো তোমাকে সহিতে হইতেছে না, তাই তুমি হাসিতেছ।"

অর্জ্জুন দ্রৌপদীকে অনেক বুঝাইলেন, মিষ্ট বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন।

দ্রৌপদীর জন্য কীচক ও উপকীচকগণ সহসা এইরূপে নিহত হইল, আবার কি বিপদ ঘটে, তাই বিরাটরাজ, সৈরিন্ধ্রীকে বিদায় করিয়া দিবার জন্য সুদেষ্ণাকে বলিলেন। দ্রৌপদী আসিলে, সুদেষ্ণা কহিলেন,—"বাছা, তোমার রূপ বড় বেসি, পুরুষের মনও বড় চঞ্চল। আবার তোমার গন্ধর্ব্বেরাও বড় দুর্দ্দান্ত। এখানে তুমি থাকিলে আবার কখন কি বিপদে পড়িব, তা'র স্থির নাই। তাই বাছা, তুমি অন্য কোথাও যাও। তোমার মত সৈরিন্ধ্রীর সেবায় আমার কাজ নাই।"

পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের কাল পূর্ণ হইবার অল্প বাকী আছে, তাই দ্রৌপদী আর তের দিনের সময় চাহিলেন। ভয়ে সুদেষ্ণা আপত্তি করিলেন না।

(৮)

পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের কাল পূর্ণ হইল। পাণ্ডবগণ তাঁহাদের প্রাপ্য রাজ্যের অংশ চাহিয়া দুর্যোধনের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পাঠাইলেন। বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমিও দুর্যোধন পাণ্ডবদিগকে দিতে প্রস্তুত হইল না। তখন কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। অষ্টাদশ দিন ধরিয়া সেই মহাযুদ্ধ চলিতে লাগিল। কুরুবংশ প্রায় নির্ম্মূল হইল।

দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পর, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রাত্রিতে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করিয়া দ্রৌপদীর নিদ্রিত পঞ্চপুত্রকে হত্যা করিলেন। এইরূপ অন্যায়রূপে পুত্রগণের নিধনে শোক অপেক্ষা দ্রৌপদীর ক্রোধ বেসি হইল। প্রতিহিংসার প্রবল বহ্নি তেজস্বিনীর হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল। তীব্র জলন্ত বাক্যে তিনি পাণ্ডবগণকে কহিলেন,—"কাপুরুষ অশ্বত্থামা শৃগালের মত রাত্রিতে শিবিরে আসিয়া আমার নিদ্রিত বীরপুত্রগণকে হত্যা করিয়াছে। তোমরা যদি অবিলম্বে ইহার উপযুক্ত প্রতিফল না কর, তবে অনশনে আমি প্রাণত্যাগ করিব।" যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সে চেষ্টায় কোন ফল হইল না।

দ্রৌপদী আবার কহিলেন,—"কাপুরুষের উপযুক্ত শাস্তি ভিন্ন, পুত্রহত্যার যোগ্য প্রতিশোধ ভিন্ন, আমার কিছুমাত্র শান্তির সম্ভাবনা নাই। অশ্বত্থামাকে নিহত করিয়া যদি তা'র মাথার

মণি * আনিয়া দিতে পার, তবেই মনে করিব তাহার পাপের উপযুক্ত প্রতিশোধ হইয়াছে; নতুবা নয়।"

ভীমসেন অবিলম্বে অশ্বত্থামার সন্ধানে বাহির হইলেন। অবিলম্বে তাহার মস্তকের মণি আনিয়া দিলেন। তাঁহাদের অস্ত্র-গুরু দ্রোণের পুত্র বলিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিলেন না। শুনিয়া দ্রৌপদী কহিলেন,—"তোমাদের গুরুপুত্র আমারও গুরু। তিনি যাহাই করিয়া থাকুন, আমাদের অবধ্য। যাহা হউক, তাঁহার মাথার মণি আনিয়াছ, ইহাতেই তাঁহার যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে। যুধিষ্ঠির এই মণি মাথায় পরুন। পুত্র-হত্যার প্রতিশোধের চিহ্নস্বরূপ এই মণি যুধিষ্ঠিরের মাথায় দেখিয়া আমি যতটুকু পারি শান্তি লাভ করিব।"

(৯)

যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অসংখ্য জ্ঞাতি ও বন্ধুবধের মনস্তাপ হইতে তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন না। পরে আত্মকলহে যাদবকুল যখন বিনষ্ট হইল, শ্রীকৃষ্ণ নিজেও যখন প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন যুধিষ্ঠিরের আর সংসারে থাকিতে ইচ্ছা রহিল না। অভিমন্যুর পুত্র একমাত্র কুরুবংশধর পরীক্ষিতের হস্তে রাজ্যভার দিয়া, ভ্রাতৃগণসহ তিনি মহাপ্রস্থান করিলেন। পাণ্ডবগণের সুখ দুঃখের চিরসঙ্গিনী দ্রৌপদীও পতিগণের মহাপ্রস্থানের সঙ্গিনী হইলেন।

* অশ্বত্থামার জন্মকাল হইতেই তাহার মাথায় একটি উজ্জ্বল মণি জন্মিয়াছিল।

শকুন্তলা।

(১)

প্রাচীন আর্য্যনারীরা একদিকে যেমন সম্পূর্ণরূপে স্বামীতে আত্মসমর্পণ করিয়া নারীজীবন সার্থক মনে করিতেন, স্বামীকে দেবতা মনে করিয়া স্বামীর সেবাই জীবনের একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন, আর্য্য পুরুষগণও তেমনি স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী ও গৃহিণীর উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করিয়া গৃহদেবতার ন্যায় তাঁহাদের সম্মান করিতেন। ক্ষত্রিয়রাজগণ সাধারণতঃ স্ত্রীকে দেবী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। দাসীর ন্যায় স্বামীসেবা করিয়াও আপনাদের এই সহধর্ম্মিণী ও গৃহিণীপদের গৌরবও প্রাচীন আর্য্যনারীরা বুঝিতেন। স্বামী কখনো স্ত্রীর যোগ্য সম্মান স্ত্রীকে না দিলে, স্বামীর সমক্ষে, তেজস্বিনী প্রাচীন আর্য্য-নারী সতেজে আপনার উচ্চ সম্মান ও পদগৌরব দাবী করিতেন। শকুন্তলার জীবনী ইহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

শকুন্তলা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কন্যা। কণ্বমুনির আশ্রমে কণ্বমুনির নিজের কন্যার মত তিনি প্রতিপালিত হইতেছিলেন।

একদিন, পুরু-বংশীয় রাজা দুষ্মন্ত, মৃগয়া করিতে করিতে কণ্বমুনির তপোবনে উপস্থিত হইলেন। কণ্বমুনি অন্যত্র ছিলেন; শকুন্তলা অতিথিকে যথোচিত অভ্যর্থনা ও সৎকার করিলেন।

শকুন্তলার রূপে ও মিষ্ট আলাপে মুগ্ধ হইয়া এবং অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার গুণের অনেক পরিচয় পাইয়া দুষ্মন্ত তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। শকুন্তলার গর্ভজাত পুত্র দুষ্মন্তের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইবেন, এই পণে, তিনি দুষ্মন্তকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। কণ্বমুনির অনুপস্থিতিতে ও অজ্ঞাতে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়া নিজ রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। আশ্রমবাসী অন্য কেহও এ বিবাহের কথা কিছু জানিল না।

প্রাপ্তবয়স্ক বরকন্যার আপনাদের ইচ্ছামত পরস্পর ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া শপথ ও মাল্যবদলে এইরূপ গোপনে যে বিবাহ হইত, প্রাচীনকালে তাহাকে গন্ধর্ব্ব-বিবাহ বলিত। দুষ্মন্ত চলিয়া গেলে, কণ্বমুনি আশ্রমে আসিয়া এই বিবাহের কথা জানিতে পারিলেন। শকুন্তলা যোগ্যপাত্রে মাল্যদান করিয়াছেন, সুতরাং কণ্ব ইহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন না।

(২)

আশ্রমে, শকুন্তলার একটি পুত্র হইল। কণ্ব যথাবিধি জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন করিলেন। ক্রমে পুত্রের ছয়বৎসর বয়স হইল। কিন্তু এই বয়সেই বালক, অমিতবলে বন্যজন্তুসকল দমন করিত। বিস্মিত আশ্রমবাসীরা বালককে "সর্ব্বদমন" বলিয়া ডাকিলেন। রাজপুত্রের কুলোপযোগী শিক্ষা আশ্রমে সম্ভব নয়, তাই কণ্ব, শকুন্তলাকে হস্তিনাপুরে রাজগৃহে পাঠাইলেন। রাজ-সভায় উপস্থিত হইয়া শকুন্তলা আত্মপরিচয় দিয়া কহিলেন,—

"মহারাজ, তোমার এই পুত্র আমার গর্ভে জন্মিয়াছে। বিবাহের সময় তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, ইহাকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তোমার উত্তরাধিকারী করিবে। তুমি এতদিন আমাদিগকে স্মরণ কর নাই। যাহা হউক, আমি নিজেই পুত্র লইয়া আসিয়াছি। এখন তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর।"

দুষ্মন্ত কহিলেন,—"তোমার সঙ্গে কবে কোথায় আমার দেখা হইয়াছে, কবে কোথায় তোমাকে বিবাহ করিয়াছি, কিছুই আমার স্মরণ হইতেছে না। তোমার মত এরূপ অপরিচিতা পুত্রবতী নারীকে আমি কিরূপে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি? এই বালককেই বা কিরূপে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতে পারি? যাহা হউক, তোমার ইচ্ছা হইলে তুমি এখানেও থাকিতে পার, অথবা, অন্য কোথাও যাইতে পার। যাহা অভিরুচি হয়, কর।"

দুষ্মন্তের এই কথা শুনিয়া শকুন্তলার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এক দুষ্মন্ত ভিন্ন এ বিবাহের কথা আর কেহই জানে না। তিনিও একেবারে বিবাহ অস্বীকার করিলেন। এখন উপায় কি? তাঁহাকে কে বিশ্বাস করিবে? এরূপ অবস্থায় তাঁহার মত পুত্রবতী নারীকে কে আশ্রয় দিবে? বিবাহঘটনা দুষ্মন্তকে স্মরণ করাইবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তেজস্বিনী অভিমানিনী শকুন্তলা এই অবজ্ঞায় ও অবমাননায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন,—"তুমি সকল ঘটনা জানিয়া-শুনিয়াও হীনলোকের মত কহিতেছ—'আমি কিছুই জানি না'? আমার কথা সত্য কি মিথ্যা, সে বিষয়ে তোমার অন্তঃকরণই সাক্ষী।

মনে একরকম জানিয়া মুখে যে অন্য রকম বলে, সে আপনাকে প্রবঞ্চিত করে,—আপনার ধর্ম্মধন আপনি চুরি করে! তা'র মত হীন চোর আর হইতে পারে না। রাজা হইয়া,—মানবসমাজের ধর্ম্মরক্ষক হইয়া তুমি এই অতি নিকৃষ্ট চোর ও প্রবঞ্চকের মত ব্যবহার করিতেছ? তোমার কি ধর্ম্মের ভয় নাই? তুমি কি মনে করিয়াছ, একা এই কর্ম্ম করিয়াছ, আর কেহ তাহা জানে না? কিন্তু জানিও,—চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, পৃথিবী, জল ও ধর্ম্ম সকলেই তোমার কার্য্যের সাক্ষী। সকলের উপরে তোমার হৃদয়স্থিত আত্মা তোমার সাক্ষী। যে, আত্মাকে অপমান করিয়া—সত্য গোপন করিয়া মিথ্যা বলে, অসন্তুষ্ট আত্মার রোষে ও ধিক্কারে তাহার জীবন দুঃখময় হয়, দেবগণও তাহার মঙ্গল করেন না।

দুষ্মন্ত, আমি পতিব্রতা, তোমার বিবাহিতা স্ত্রী, নিজে তোমার কাছে উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া অবজ্ঞা করিও না। আমি তোমার স্ত্রী, সর্ব্বথা তোমার আদরের ও সম্মানের যোগ্য। সভামধ্যে সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় আমাকে অবজ্ঞা করিও না।"

দুষ্মন্ত কথা কহিলেন না। শকুন্তলা আরও উত্তেজিত হইয়া কহিলেন,—"তুমি নীরবে রহিয়াছ? আমার কথার উত্তর দিতেছ না? আমার সকল কথাই কি অরণ্যে রোদনের ন্যায় নিষ্ফল হইল? তোমার কি ধর্ম্মের ভয় নাই? পুরুষ হইয়া, ক্ষত্রিয় হইয়া, রাজা হইয়া, তুমি স্ত্রীর মর্য্যাদা জান না? সভামধ্যে নিজের স্ত্রীকে এই অবমাননা করিতেছ? স্ত্রী ধর্ম্মকার্য্যের সঙ্গিনী,

গৃহের গৃহিণী, অসহায়ের সহায়, বিপদের বল, পীড়িতের জননী, পথিকের বিশ্রামস্থান স্বরূপ। স্ত্রী, স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ পরম বন্ধু—ধর্ম্ম সাধনের সহায়। যা'র স্ত্রী আছে, তা'কেই লোকে গৃহী বলিয়া সম্মান করে, সকল কার্য্যে বিশ্বাস করে। স্ত্রী হইতেই পুত্রলাভ করিয়া লোকে পিতৃঋণ শোধ করে,—পিতৃপুরুষগণকে পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার করে। পুত্র পিতার ও পিতৃপুরুষগণের আত্মস্বরূপ। স্ত্রীর গর্ভ হইতে পুরুষ, আত্মস্বরূপ পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃপুরুষের বংশপরম্পরা রক্ষা করে, তাই স্ত্রীকে জায়া বলে।—পুত্রবতী স্ত্রী মাতার ন্যায় সকলের পূজনীয়া।—

'—পুত্র, তুমি আমার অঙ্গ হইতে এবং হৃদয় হইতে জন্মিয়াছ। তুমি আমার পুত্রনামধারী আত্মা, আমার জীবন তোমার অধীন, আমার অক্ষয় বংশ তোমার অধীন, তুমি সুখী হইয়া, শতবৎসর জীবিত থাক।—' এই মন্ত্র পড়িয়া লোকে পুত্রের জাতকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ধর্ম্মসাধনার ফল, সার্থক জীবনের ফল, পিতৃঋণ পরিশোধের উপায়, বংশের আশ্রয়, আত্মস্বরূপ আত্মজ পুত্র যাঁ'র গর্ভে জন্মে, বংশের মঙ্গলকারিণী সেই স্ত্রী, পতিকুলের সকলেরই আদর ও সম্মানের পাত্রী। কোন্ মোহে ভ্রান্ত হইয়া আজ তুমি কুলের শ্রেষ্ঠ রত্নস্বরূপ পুত্র এবং কুলের লক্ষ্মীরূপিণী সেই পুত্রের জননীকে ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ? রাজন্, তোমার ধর্ম্মবুদ্ধি মোহমুক্ত হউক। কুল ও বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুত্রকে, এবং সেই পুত্রপ্রসবিনী ধর্ম্মপত্নীকে কখনো ত্যাগ

করিও না। কপটতা ত্যাগ করিয়া, সত্যপালন কর। সত্যপালন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম আর নাই। সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষাও এক সত্যপালন শ্রেষ্ঠ। সত্যই বেদ, সত্যই ব্রহ্ম, সত্যপালন—প্রতিজ্ঞা পালন—সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। যদি জানিয়াও সত্যভ্রষ্ট হও,—মিথ্যার বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে অশ্রদ্ধা কর,—আমি তোমার আশ্রয় চাই না। আমি এখনই এস্থান হইতে প্রস্থান করিব। কিন্তু জানিও, পুরুবংশধর আমার এই পুত্র, কখনো পৃথিবীতে হীন হইয়া থাকিবে না। আমার এই পুত্রই একদিন সসাগরা ধরার অধীশ্বর হইয়া যশস্বী হইবে।”

এই বলিয়া শকুন্তলা নীরব হইলেন। সহসা দৈববাণী হইল,—“রাজন্, শকুন্তলা তোমার পরিণীতা স্ত্রী, এই পুত্র তোমারই পুত্র। নিঃশঙ্কচিত্তে তুমি স্ত্রীপুত্রকে গ্রহণ কর।”

দৈববাণী শুনিয়া দুষ্মন্ত সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“আপনারা সকলে দৈববাণী শুনিলেন। শকুন্তলা যে আমার স্ত্রী, এই বালক যে আমার পুত্র, দেবতা এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন। ইহার পর এ সম্বন্ধে আপনাদের মনে কোনরূপ দ্বিধা হইবার কারণ কি থাকিতে পারে?”

পরে, শকুন্তলাকে কহিলেন,—“শকুন্তলা, তুমি যে আমার স্ত্রী এবং এই বালক যে আমার পুত্র, তাহা আমি জানিতাম। কিন্তু তুমি ও আমি ভিন্ন এই বিবাহের কথা আর কেহ জানিত না। সহসা পুত্রসহ-আগত তোমাকে আমি যদি গ্রহণ করিতাম, লোকে নানা কথা কহিত। লোকসমাজে তুমি কলঙ্কিনী হইয়া

থাকিতে। পুরুবংশধরও তোমার ও আমার এই কলঙ্কে কলঙ্কিত জীবন বহন করিত। তাই, দেবগণের আদেশ-অপেক্ষায় এতক্ষণ আমি এইরূপ ব্যবহার করিয়াছি। তুমি আমাকে মার্জ্জনা কর।”

দুঃষ্মন্ত সাদরে স্ত্রী-পুত্রকে গ্রহণ করিলেন। মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গও অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। দুষ্মন্ত এই পুত্রের নাম রাখিলেন—ভরত। এই পুত্রের নাম হইতে ইঁহার পরবর্ত্তী পুরুবংশ ভারতবংশ নামে প্রসিদ্ধ হইল। ভারতবংশের বিবরণ বলিয়াই, মহাভারতের মহাভারত নাম। ভারতবংশের শাসিত বলিয়াই এই দেশের নাম ভারতবর্ষ।

শর্ম্মিষ্ঠা।

(১)

পূর্ব্বে, সতী নামক আখ্যায়িকায় লিখিত হইয়াছে, দেব, দৈত্য, দানব, মানব, পশু, পক্ষী প্রভৃতি দিব্য ও পার্থিব প্রাণী সকলেই ব্রহ্মার মানসপুত্র আদি-ঋষিগণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। অতি প্রাচীনকালে ইঁহারা সকলেই অতি নিকট-ভ্রাতৃত্বে এবং সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। প্রাচীন দৈত্য-রাজনন্দিনী শর্ম্মিষ্ঠা হইতেই ভারতবর্ষের অনেক প্রাচীন ক্ষত্রিয়-বংশ সম্ভূত হইয়াছে। এই আখ্যায়িকার প্রসঙ্গে ইঁহাদের অভিন্ন সৃষ্টি এবং সৃষ্টির পরে বহুকাল পর্য্যন্ত ইঁহাদের অভিন্ন সম্বন্ধ বিষয়ে আগে কিছু বলি।

আদিঋষি মরীচের পুত্র কশ্যপ— অদিতি, দিতি, দনু, বিনতা, কদ্রু প্রভৃতি দক্ষপ্রজাপতির তের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই অদিতিই সূর্য্য, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের এবং মানবগণের আদি মাতা। দিতি হইতে দৈত্য এবং দনু হইতে দানবগণের জন্ম হইয়াছে। বিনতার পুত্র অরুণ ও গরুড়। সীতার গল্পে যে জটায়ুর উল্লেখ আছে, সেই জটায়ু এই অরুণের পুত্র। কদ্রু হইতে নাগকুলের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা যে মনসা-দেবীর পূজা করিয়া থাকি, তিনি এই নাগবংশ-সম্ভূতা কন্যা এবং মহর্ষি জরৎকারুর স্ত্রী। অদিতির পুত্র সূর্য্য হইতে মনুর

উৎপত্তি হয়, এই মনুই মানববংশের আদি। ইঁহার ইক্ষ্বাকু নামক পুত্র হইতে অযোধ্যার সূর্য্যবংশ উৎপন্ন হয়। রামচন্দ্র এই সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। আবার, আদিঋষি অত্রির সন্তান চন্দ্রদেবের পুত্র বুধ, মনুর কন্যা ইলাকে বিবাহ করেন। ইঁহাদের পুত্র পুরুরবা চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ। এ দিকে, আদিঋষি অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি ও ভৃগুর পুত্র শুক্র যথাক্রমে দেব ও দৈত্যগণের গুরু ছিলেন।

শর্ম্মিষ্ঠা দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বের কন্যা। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের দেবযানী নামে শর্ম্মিষ্ঠার সমবয়স্কা এক কন্যা ছিল। একদিন শর্ম্মিষ্ঠা, দেবযানী এবং শর্ম্মিষ্ঠার সখীগণ সকলে নদীতে স্নান করিতেছিলেন। স্নানান্তে উঠিয়া পরিবার জন্য, নদীতীরে তাঁহাদের সকলের কাপড় ছিল। বাতাসে সব কাপড় মিশিয়া যায়; শর্ম্মিষ্ঠা ভুলে দেবযানীর কাপড় পরেন। দেবযানী ইহাতে বড় রাগিয়া কহিলেন,—"শর্ম্মিষ্ঠা, তুমি আমার পিতার শিষ্যকন্যা হইয়া কোন্ সাহসে আমার কাপড় পরিয়াছ? শর্ম্মিষ্ঠা হাসিয়া কহিলেন,—"আমি রাজকন্যা, তোমার পিতা আমার পিতার স্তবস্তুতি করিয়া ভিখারীর মত আমার পিতার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছেন। তোমা-অপেক্ষা আমি বড় বই ছোট নই। আমি তোমার কাপড় পরিয়াছি বলিয়া তোমার কোন অবমাননা হয় নাই।"

ক্রমে উভয়ের মধ্যে এই কথা লইয়া বিষম কলহ উপস্থিত হইল। দেবযানী বলপূর্ব্বক শর্ম্মিষ্ঠার পরা কাপড় খুলিয়া

নিবার চেষ্টা করিলেন। ইহাতে কোন্দল খুব বাড়িল। শেষে হাতাহাতি হইল। শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীকে এক শুষ্ক কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

পূর্ব্বে, বুধ ও ইলার পুত্র চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ যে পুরুরবার কথা বলিয়াছি, সেই পুরুরবার প্রপৌত্র রাজা যযাতি এই সময়ে মৃগয়া করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া ঐ কূপের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবযানীকে কূপের মধ্যে পতিত দেখিয়া তিনি তাঁহাকে উঠাইলেন। গৃহে না গিয়া রাগে ও দুঃখে অধীর হইয়া দেবযানী ঐ স্থানে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ঘূর্ণিকা নামে শুক্রাচার্য্যের এক দাসী দৈবক্রমে সেইখানে আসিল। দেবযানী তাহাকে শর্ম্মিষ্ঠার ব্যবহারের কথা সমস্ত বলিয়া, কহিলেন,—"ঘূর্ণিকা, তুমি পিতার কাছে যাইয়া বল, শর্ম্মিষ্ঠার এই অপমান ও অত্যাচারের পর আমি আর দৈত্য-রাজপুরীতে যাইব না।"

সকল কথা শুনিয়া শুক্রাচার্য্য তৎক্ষণাৎ দেবযানীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। দেবযানীকে অনেক প্রবোধ দিয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু দেবযানী কহিলেন,— "পিতা, আমি বালিকা হইলেও ধর্ম্মের মর্ম্ম না বুঝি এমন নয়। কোন্ অবস্থায় ক্রোধ, কোন্ অবস্থায় ক্ষমা করিতে হয়, তাহাও জানি। শিষ্য হইয়া গুরুর সম্মান যে জানে না, ধনগর্ব্বে যে ধার্ম্মিকের অবমাননা করে, সে কখনো ক্ষমার যোগ্য নয়।

যেখানে এরূপ ব্যবহার হয়, ধার্ম্মিক কেহ কখনো সেখানে থাকিতে পারেন না। শর্ম্মিষ্ঠার যে অপরাধ, তাহা ক্ষমার যোগ্য নয়। শর্ম্মিষ্ঠার পিতার আশ্রিত হইয়াও আমি থাকিব না।"

কন্যার কথার যুক্তিযুক্ততা বুঝিয়া, শুক্রাচার্য্য, দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বের নিকট গিয়া সকল ঘটনা তাঁহাকে বলিয়া, কহিলেন,—"দেবযানীকে সন্তুষ্ট কর, নহিলে কন্যার সঙ্গে আমিও তোমার রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব।"

শুক্রাচার্য্যের বুদ্ধি ও মন্ত্রণাবলেই বৃষপর্ব্ব ও দৈত্যগণ দেবগণের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হইয়া আপনাদের প্রভুত্ব রক্ষা করিতেছিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেলে, দৈত্যকুলের সর্ব্বনাশ। বৃষপর্ব্ব গুরুর সঙ্গে দেবযানীর নিকটে গিয়া, তাঁহাকে অনেক স্তুতি করিতে লাগিলেন। দেবযানী কহিলেন,—"শর্ম্মিষ্ঠা তাহার সখীগণ সহ আমার দাসী হইবে। আমার বিবাহ হইলে, দাসীরূপে আমার পতিগৃহে যাইবে। যদি সে ইহাতে স্বীকৃত হয়, তবে আমি ও আমার পিতা, আপনার গৃহে থাকিব,—নতুবা নয়।"

বৃষপর্ব্ব অবিলম্বে শর্ম্মিষ্ঠাকে আনিবার জন্য নিকটস্থ এক-জন পরিচারিকাকে পাঠাইলেন। পরিচারিকা শর্ম্মিষ্ঠাকে সকল অবস্থা কহিয়া, বৃষপর্ব্বের আদেশ জানাইল। সাময়িক উত্তেজনা-বশতঃ দেবযানীর প্রতি তিনি যেরূপ ব্যবহারই করিয়া থাকুন, শুক্রাচার্য্য যে নিজ শক্তিবলে দৈত্যকুলের অবলম্বন স্বরূপ,—শুক্রাচার্য্যের অভাবে দেবগণের হস্তে যে, দৈত্যকুল নির্ম্মূল

হইবে, শর্ম্মিষ্ঠা তাহা জানিতেন। তিনি কহিলেন,—"সে কি! আমার জন্য শুক্রাচার্য্য দৈত্যরাজ্য ত্যাগ করিবেন?—দৈত্যকুলের সর্ব্বনাশ হইবে?—ইহা কখনো হইতে পারে না! ঘূর্ণিকা, চল, দেবযানীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য—দৈত্যকুলের মঙ্গলের জন্য আমি সন্তুষ্টচিত্তে দেবযানীর দাসীত্ব স্বীকার করিব।"

এই বলিয়া শর্ম্মিষ্ঠা পরিচারিকার সঙ্গে সেই বনে শুক্রাচার্য্য, বৃষপর্ব্ব এবং দেবযানীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"গুরুপুত্রি, আজ হইতে আমি ও আমার সখীগণ সকলে তোমার দাসী হইলাম। তোমার বিবাহ হইলেও, দাসীরূপে তোমার পতিগৃহে যাইব। আজীবন তোমার ও তোমার পতিপুত্রগণের দাসীত্ব করিব। আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমার দোষে দৈত্যরাজগৃহ ত্যাগ করিয়া তোমরা যাইও না।"

দেবযানী ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন,—"তুমি রাজকন্যা হইয়া এখন তোমার পিতার স্তুতিবাদক—তোমার পিতার অন্নে প্রতিপালিত ভিখারীর কন্যার দাসী হইবে?"

শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন,—"দৈত্যকুলে জন্মিয়াছি, দৈত্যরাজ্যে প্রতিপালিত হইয়াছি, এখন সেই কুলের, সেই রাজ্যের মঙ্গলের জন্য তোমার চিরদাস্য অবলম্বন করিলাম। ইহাতে আমার দুঃখের বা অপমানের কিছুই নাই।"

স্বজাতি ও স্বদেশের মঙ্গলের জন্য, গর্ব্বিতা রাজকুমারী যাহাকে একদিন সগর্ব্বে পিতার আশ্রিত বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলেন, সেই দেবযানীরই দাসী হইয়া রহিলেন।

(২)

কিছুকাল পরে দেবযানী স্ব-ইচ্ছায় যযাতি রাজাকে পতিত্বে বরণ করেন। কন্যাস্নেহপরায়ণ শুক্রাচার্য্য, দেবযানীর এই বিবাহে অনুমোদন করিলেন। পূর্ব্ব-অঙ্গিকারমত শর্ম্মিষ্ঠাও দাসীরূপে দেবযানীর সঙ্গে যযাতি রাজার গৃহে গেলেন। শর্ম্মিষ্ঠার রূপেগুণে মুগ্ধ হইয়া, যযাতি দেবযানীর অজ্ঞাতে গোপনে শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেন। পরে এই কথা প্রকাশ হইলে দেবযানীর কোপে শুক্রাচার্য্যের নিকট যযাতিকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু সে যাহা হউক, এইরূপে মানব-বংশীয় রাজা যযাতির সঙ্গে দৈত্যগুরু ঋষি শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী এবং দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বের দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠার বিবাহ হইল।

দেবযানীর পুত্র যদু হইতে যদুবংশের এবং শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র পুরু হইতে পুরুবংশের উৎপত্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণ এই যদুবংশে এবং পাণ্ডব ও কৌরবগণ পুরুবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠার অন্যান্য পুত্রগণ হইতে নানাদেশীয় ম্লেচ্ছ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

জনা ।

(১)

প্রাচীন কালে মাহিষ্মতীনগরে নীলধ্বজ নামে এক রাজা ছিলেন। জনা এই নীলধ্বজ রাজার মহিষী। গঙ্গাদেবীর প্রতি জনার বিশেষ ভক্তি ছিল। গঙ্গার আরাধনা করিয়া, গঙ্গার বরে তিনি প্রবীর নামে এক মহাবীর পুত্র লাভ করেন।

এই সময়, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর, মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞের অশ্বরক্ষার ভার লইয়া অর্জ্জুন পৃথিবী পর্য্যটনে বাহির হইলেন। অনেক দেশের রাজগণকে পরাজিত করিয়া অশ্বসহ বিজয়ী অর্জ্জুন মাহিষ্মতী নগরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। অশ্ব মাহিষ্মতীনগরে প্রবেশ করিল। জনার পুত্র মহাতেজস্বী যুবক প্রবীর সেই অশ্ব ধরিলেন।

এখন, হয় হীনতা স্বীকার করিয়া অর্জ্জুনকে অশ্ব ফিরাইয়া দিতে হইবে, না হয় সম্মুখসমরে অর্জ্জুনের সঙ্গে নীলধ্বজ এবং প্রবীরকে যুদ্ধ করিতে হইবে।

বীরত্বে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন অজেয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহায় ও সহচর। অর্জ্জুনের বীরত্ব ও শ্রীকৃষ্ণের কৌশল, এই দুইয়ের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিবার আশা দেবতারাও করিতে পারিতেন না। এই যুদ্ধের ফল নিশ্চিত পরাজয়, মৃত্যু এবং রাজ্যনাশ।

রাজা নীলধ্বজ যার-পর-নাই ভীত হইলেন। বিশেষ, তিনি অতিশয় কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। যে কৃষ্ণকে তিনি দেবতা বোধে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া আসিয়াছেন, আজ শত্রুরূপে কি-প্রকারে তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইবেন? যুদ্ধ করা দূরের কথা; যদি পূজা করিয়া একবার শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার রাজপুরীতে আনিতে পারেন, তবে তাঁহার জীবন ধন্য হইবে, পুরী পবিত্র হইবে।—এইরূপ, কতক ভয়ে, কতক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রবল ভক্তি বশতঃ নীলধ্বজ যুদ্ধ না করিয়া অশ্ব ফিরাইয়া দিতে সংকল্প করিলেন।

সদর্পে অশ্ব ধরিয়া এখন বিনাযুদ্ধে হীনতা স্বীকার করিয়া তাহা পাণ্ডবকে ফিরাইয়া দিতে হইবে, এ চিন্তা প্রবীরের অসহ্য বোধ হইল। পিতার দুর্ব্বলতায় বীরকুমার নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু তিনি কি করিবেন? নীলধ্বজ তাঁহার পিতা, দেশের রাজা। তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিবার অধিকার তাঁহার কোথায়? ঘৃণায় ও অপমানে যদি তাহাকে মরিতে হয়, যদি লোকালয় ত্যাগ করিয়া বনে লুকাইতে হয়, তবু পিতার আদেশ—রাজার আদেশ তাঁহাকে পালন করিতেই হইবে। কিন্তু তা'ই বলিয়া বীর হইয়া বীরধর্ম্মের, ক্ষত্রিয় হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের এই দারুণ অবমাননা তিনি কি প্রকারে সহ্য করিবেন? চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে প্রবীর জননীর শরণাপন্ন হইলেন। প্রবীর জানিতেন, জনার হৃদয় ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের মহত্ত্বে পরিপূর্ণ। প্রকৃত ক্ষত্রিয়নারী ক্ষত্রিয়জননী জনা, বিজয়ী শত্রুর পদতলে অবনত পুত্রের জীবন অপেক্ষা

সম্মুখসমরে শত্রুর অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া তাহার সহস্রবার মৃত্যুও তিনি অধিক শ্লাঘনীয় বলিয়া মনে করিবেন।

পুত্রের বীরবাসনায় জনা আপনার মাতৃজীবন ধন্য মনে করিলেন। তাঁহার গঙ্গাভক্তি ও আরাধনা আজ সার্থক বলিয়া মনে হইল। বীরপুত্রের কামনা আজ তাঁহার প্রকৃত রূপেই পূর্ণ হইল। প্রাণভয়ে প্রবল শত্রুর নিকট অবনত না হইয়া, প্রথম যৌবনে জীবনের পূর্ণ সুখের সময়, রাজপুরীর ঐশ্বর্য্য বিলাস সম্ভোগের সকল বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া—বীরপুত্র বীরত্ব মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া সম্মুখসমরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত,—ইহা অপেক্ষা ক্ষত্রিয় জননীর কাম্য আর কি হইতে পারে? বীরমাতার ইহা অপেক্ষা গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে? প্রসন্নচিত্তে জনা পুত্রকে কহিলেন,—"পুত্র, তোমার কথা শুনিয়া আমি যার-পর-নাই সুখী হইলাম। মা জাহ্নবী তোমার বীরবাসনা পূর্ণ করুন। তোমার কোন চিন্তা নাই। রাজা যাহাতে এই হীন সন্ধির সংকল্প ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হন, তাহা আমি করিব।"

হৃষ্ট ও কৃতজ্ঞচিত্তে জননীকে প্রণাম করিয়া প্রবীর নিজ আবাসে প্রস্থান করিলেন।

(২)

অন্যদিকে জনা স্বামীর নিকট গিয়া পুত্রের বাসনা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। নীলধ্বজ কহিলেন,—"কৃষ্ণার্জ্জুনের সঙ্গে

সম্মুখসমরে পরাজয়, মৃত্যু ও রাজ্যনাশ নিশ্চিত। জানিয়া শুনিয়া কোন্ মূর্খ এই বিপদ মাথায় তুলিয়া লইতে পারে? যুধিষ্ঠির ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজা। বীরত্বে পাণ্ডবগণের সমকক্ষ কেহ নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনি তাঁহাদের সহায়। এ হেন পাণ্ডবদের নিকট ক্ষুদ্র আমাদের অবনতি স্বীকারে এমন অপমানই বা কি?"

শুনিয়া জনা কহিলেন,—"ধিক্! ক্ষত্রিয় হইয়া, রাজা হইয়া কোন্ মুখে তুমি এমন কথা কহিলে? কিছুমাত্রও ক্ষত্রিয়ের মর্য্যাদা-বোধ যে ক্ষত্রিয়ের আছে, সে কি আপনাকে কাহারও অপেক্ষা হীন মনে করিতে পারে? পাণ্ডবদের মত বিস্তৃত রাজ্য তোমার নাই সত্য, পাণ্ডবদের মত অতুল ঐশ্বর্য্য তোমার নাই সত্য, পাণ্ডবদের মত বিজয় গৌরবে তুমি এখনও দীপ্ত হও নাই সত্য, কিন্তু তা'ই বলিয়া পাণ্ডবদের নিকট তুমি ক্ষুদ্র, এই হীন চিন্তা পুরুষ হইয়া তোমার মনে কেন উদয় হইতেছে? পাণ্ডবও ক্ষত্রিয়, তুমিও ক্ষত্রিয়। তা'রা ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের উপাসক, তুমি ও তোমার পুত্রও ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের উপাসক। যে ধর্ম্মবলে তা'রা বলীয়ান্, সেই ধর্ম্মবল তোমার ও তোমার পুত্রের হৃদয়েও বর্ত্তমান। ক্ষত্রিয় হইয়া ক্ষত্রিয়ের নিকট যে দুর্ব্বল বলিয়া পরিচয় দেয়, রাজা হইয়া রাজার নিকট যে হীনতা অবলম্বন করে, সে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের, রাজধর্ম্মের অবমাননা করে। ধর্ম্মের অবমাননাকারী মানব, ইহলোকে লোকসমাজে ঘৃণিত হয় এবং পরলোকে নিরয়গামী হয়।

মহারাজ, নিজের ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ও রাজধর্ম্ম স্মরণ কর। নিজের ও মহাবীর পুত্রের বাহুবলের উপর ভরসা কর। কেন ভয় পাও? মৃত্যুভয় কি ক্ষত্রিয়কে কখনো ভীতি প্রদর্শন করিতে পারে? মৃত্যুভয়ে কি ক্ষত্রিয় কখনো যুদ্ধে ক্ষান্ত হয়?

—আর, পরাজয়ের চিন্তাই বা কেন? ভয়ে যে বিনাযুদ্ধে শত্রুর পদানত হয়, প্রাণের মমতায় অস্ত্রাঘাতের ব্যথায়, যে রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে, সে-ই পরাজিত। শত্রুসেনা নাশ করিতে করিতে অসিহস্তে যে বীর শত্রুর শোণিতে সিক্ত পবিত্র রণ-ভূমিতে দেহপাত করে, তাহাকে কখনো পরাজিত বলা যাইতে পারে না। পাশববলে অভিভূত হইলেও, বীরত্বমহিমায় মৃত্যুকে জয় করিয়া সে বীর, বিজয়ীর উপর বিজয়ী হয়। রণবিজয়ীর গৌরব কেবল এই মর্ত্ত্যভূমিতে; কিন্তু, এই মৃত্যুবিজয়ীর গৌরবালোকে অমরলোক পর্য্যন্ত আলোকিত হয়।

তা'রপর, ধর্ম্মপালনের জন্য যদি রাজ্যনাশ হয়, তাহাতেই বা তুমি কুণ্ঠিত কেন? রাজ্য, সম্পদ্, গৃহ, জীবন, কিছুই পৃথিবীতে চিরস্থায়ী নয়। যুগে যুগে, বর্ষে বর্ষে, কত পুরাতন রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া নূতন রাজ্য স্থাপিত হইতেছে। একের সম্পদ্ বিনষ্ট হইয়া অন্যের সম্পদ্ হইতেছে। একের গৃহ ভাঙ্গিয়া, অন্যের গৃহ গড়িতেছে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত জীবন ফুরাইতেছে, আবার কত নূতন জীবন পৃথিবীতে আসিতেছে,—এমন নশ্বর রাজ্য, সম্পদ্, গৃহ কিংবা জীবনের মমতায়, জ্ঞানী ধার্ম্মিক কে ধর্ম্মলঙ্ঘন করিতে চায়? যশস্বী কে কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলিয়া নিতে চায়? স্বাধীন

বীর কে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া হীন কাপুরুষ-জীবন বহন করিতে চায়?

—মহারাজ, তুমি পুরুষ, তুমি বীর, তুমি রাজা; আমি সামান্য রমণী। আমি তোমাকে কি বুঝাইব? মোহে ভ্রান্ত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইও না। আপনাকে হীন মনে করিলেই মানুষ ক্রমে মনুষত্ব হারাইয়া হীন হইয়া পড়ে। যা'র মনুষ্যত্বের মর্য্যাদাবোধ, বীরত্বের—ক্ষত্রিয়ত্বের মর্য্যাদাবোধ আছে, তাঁ'র কখনো এরূপ হীনত্বের অনুভূতি হয় না। শত্রু যতই প্রবল হউক না, যে বীর, সে বীরধর্ম্মের সম্মান ও বীরকুলের গৌরব রক্ষার জন্য সমান জ্ঞানে সমরে শত্রুর সম্মুখীন হয়; হাসিতে হাসিতে সমরক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করে।—শত্রু-পদানত হীনজীবন লইয়া কখনো গৃহে ফেরে না।"

বীরপত্নীর তেজোপূর্ণবাক্যে নীলধ্বজ আপনার ভীতি ও কাপুরুষতা স্মরণ করিয়া বড়ই লজ্জিত হইলেন। পাণ্ডবের অধীন হইয়া হীনজীবন ধারণ করা অপেক্ষা পুত্রসহ রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করা অধিকতর কাম্য বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত হইয়া, কৃষ্ণের সঙ্গে শত্রুতা করিতে তাঁহার মন সরিল না। তাই তিনি আবার কহিলেন,—"তোমার কথায় আমার ভ্রান্তি দূর হইয়াছে। গর্ব্বিত শত্রুর পদানত না হইয়া পুত্রসহ যুদ্ধে প্রাণ দিতে আমি প্রস্তুত হইব। কিন্তু আমি চিরদিন কৃষ্ণভক্ত। ইষ্টদেব স্বয়ং মানবরূপে পাণ্ডবের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত। কি করিয়া আমি তাঁহার সঙ্গে

শত্রুতা সাধনে প্রবৃত্ত হই ? কোন্ প্রাণে তাঁহার দেহে অস্ত্র নিক্ষেপ করিব ? যদি কৃষ্ণ রুষ্ট হন, পরলোকে আমার কি গতি হইবে ?”

জনা কহিলেন,—“মানবগণ পৃথিবীতে নিজ নিজ ধর্ম্মপালন করিবে ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়। ক্ষত্রিয়ের বীরধর্ম্ম তাঁহারই বিধান। মানবরূপে যদি তিনি এক ক্ষত্রিয়ের সহায় হইয়া অন্য ক্ষত্রিয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হন, ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মপালনের জন্য—তাঁহার বিধানের গৌরব রক্ষার জন্য, সে ক্ষত্রিয়কে তখন তাঁহারই বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে হইবে। যদি কৃষ্ণ ইহাতে রুষ্ট হন, তবে তিনি দেবতা ন’ন, সামান্য মনুষ্য মাত্র। ভগবানের অবতার ন’ন, অবতার-নামধারী হীন প্রবঞ্চক। মানবের ক্রোধে, প্রবঞ্চকের কোপে তোমার ইহকাল পরকাল কিছুরই কোন ভয় নাই।”

নীলধ্বজ আর আপত্তি করিলেন না। যুদ্ধে সম্মতি দান করিলেন।

(৩)

রাজ্যময় যুদ্ধের সাড়া পড়িল। রাজার উৎসাহ, রাণীর উৎসাহ, যুবরাজের উৎসাহ,—সৈন্যগণ, সেনাপতিগণ, প্রজাগণ, সকলেই রণোন্মাদে মত্ত হইয়া উঠিল। মহাবীর প্রবীর সৈন্য-ভার লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন।

প্রথমদিনের যুদ্ধে প্রবীরের জয় হইল। বিশ্ববিজয়ী অর্জ্জুন তরুণযুবক প্রবীরের বীরত্বে পরাজিত হইলেন।

কিন্তু পরদিন, শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে, পাণ্ডববিজয়ী মহাবীর প্রবীর, রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের আর পুত্রশোকাতুর নীলধ্বজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া অপদস্থ করিতে ইচ্ছা হইল না। প্রকৃত বীর চিরদিনই বীরত্বে মুগ্ধ। তাঁহারা সসম্মানে নীলধ্বজকে অভিবাদন করিয়া নীলধ্বজের বন্ধুত্বের উপহার স্বরূপ যজ্ঞীয় অশ্ব প্রার্থনা করিলেন।

কৃষ্ণভক্ত মহাপ্রাণ নীলধ্বজ শ্রীকৃষ্ণের বিনয় ও অমায়িকতায় পুত্রশোক বিস্মৃত হইয়া প্রশান্তচিত্তে অর্জ্জুনকে বন্ধুরূপে আলিঙ্গন করিলেন। প্রার্থিত যজ্ঞের অশ্ব ফিরাইয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে নিজ পুরীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। ইষ্ট-দেবতা শ্রীকৃষ্ণের পদধূলিতে তাঁহার পুরী পবিত্র হইল, নীলধ্বজ জীবন ধন্য মনে করিলেন।

প্রবীরের শোকে রোদন-মুখরিত নগরে, শোকাতুর নাগরিক-গণকে নীলধ্বজ আনন্দ-উৎসব করিতে আদেশ করিলেন। শোকান্ধকারাচ্ছন্ন নগর আলোকমালায় হাসিয়া উঠিল আকাশে পতাকা-সারি উড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ঘোষণা করিল। রাজ-পথে তোরণদ্বারে স্থানে স্থানে মঙ্গলঘট বসিল, মঙ্গল বাজনা বাজিতে লাগিল।

তেজস্বিনী জনার পক্ষে এই আনন্দোৎসব অসহ্য হইল। পুত্রের বীরত্বগৌরবের চিন্তায়, দারুণ পুত্রশোকও তিনি সহ্য করিতেছিলেন। কিন্তু, কৃষ্ণই হউন, আর কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনই

হউন, শত্রুরূপে আসিয়া তাঁহারা যুদ্ধে তাঁহার প্রাণাধিক পুত্রকে হত্যা করিয়াছেন। এই নিদারুণ শোক ভুলিয়া, ক্ষত্রিয়ের ন্যায় পুত্রহত্যার প্রতিশোধের চেষ্টা না করিয়া, রাজা, পুত্রহন্তা বিজয়ী শত্রু কৃষ্ণার্জ্জুনকে নিজ পুরীতে আহ্বান করিয়া আনন্দ উৎসবে মত্ত হইয়াছেন; এই চিন্তায়, ঘৃণায় ও ক্রোধে তেজস্বিনীর হৃদয়ে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া রোষপ্রদীপ্তনয়নে অগ্নিময়বাক্যে জনা কহিলেন,—"মহারাজ! আজ তোমার পুরীতে আনন্দ উৎসব কেন? প্রবীর কি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছে? নগরে কি আজ প্রবীরের পাণ্ডববিজয়-উৎসব হইতেছে? কই মহারাজ, প্রবীর কোথায়? কই, শিরে বিজয় কিরীট পরিয়া, কণ্ঠে বিজয়-মাল্য ধরিয়া প্রবীর তো তোমাকে কি আমাকে অভিবাদন করিতে আসিল না?

প্রবীরের রক্তাক্ত ধূলি ধূসরিত প্রাণহীন দেহ এখনো রণক্ষেত্রে লুটাইতেছে। শৃগাল গৃধিনীরা যে, সদ্য মাংস লালসায় তা'র সেই দেহ বেড়িয়া বিকট আনন্দধ্বনি করিয়া নৃত্যে রণভূমি কম্পিত করিতেছে,—চল, একবার রণক্ষেত্রে যাইয়া সেই দৃশ্য দেখিয়া আইস! তা'রপর প্রবীরের ধূলিমাখা শোণিতের অঞ্জলি দিয়া তোমার ইষ্টদেবের চরণ বন্দনা কর।

কৃষ্ণ আজ তোমার কে? ভক্তের আরাধনায় তুষ্ট দেবতা যেমন মঙ্গল-আশীর্ব্বাদ লইয়া ভক্তের গৃহে আগমন করেন, তিনি কি আজ তেমনি তোমার গৃহে আসিয়াছেন? তোমার

নয়নের আনন্দ, গৃহের অবলম্বন, রাজ্যের ভরসা একমাত্র পুত্র আজ কৃষ্ণের কৌশলে রণভূমির শোণিত-সিক্ত ধূলিতে অসাড় কলেবরে লুণ্ঠিত। এই কি তাঁ'র মঙ্গল আশীর্ব্বাদ! কোন্ প্রাণে, কোন্ মুখে তুমি আজ কৃষ্ণের পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছ? যদি ক্ষত্রিয় হইতে, ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে, তবে জানিতে—কৃষ্ণ আজ তোমার শত্রু! শত্রুর সহায় হইয়া যুদ্ধার্থীরূপে তোমার দ্বারে উপস্থিত, শত্রুরূপে কৃষ্ণ আজ তোমার বীরপুত্রের হন্তা!

—জানিতে, পূজা না করিয়া, আনন্দোৎসব না করিয়া, পুত্র-হত্যার প্রতিশোধের জন্য, তোমার রাজ-গৌরবের অবমাননার প্রতিশোধের জন্য, অসিহস্তে শত্রুরূপে তাঁ'র সম্মুখে তুমি উপস্থিত হইলে আজ তাঁ'র যোগ্য অভ্যর্থনা হইত!

ধিক্ তোমাকে! তোমাকে বলিবার আর কিছুই নাই। ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, মহৎ ক্ষত্রিয় নামের কলঙ্ক-ধ্বজা আজ তুমি তুলিয়াছ,—নিজের হীনতায় এই মহৎকুলে আজ তুমি কালী লেপিয়া দিয়াছ! এখনো যদি মোহ ভ্রান্তি কাটিয়া থাকে, যদি নাম রাখিতে চাও, বীরকীর্ত্তি রাখিতে চাও, বংশের গৌরব রাখিতে চাও,—নিমন্ত্রিত অতিথির সম্মান আজ রাখিয়া কা'ল সম্মুখযুদ্ধে তাঁ'দিগে আহ্বান কর। যদি পুত্রহন্তার শোণিতে পুত্রের প্রেত-তর্পণ না করিতে পার, নিজের শোণিতে কর।"

নীলধ্বজ জনাকে প্রবোধ বাক্যে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু জনার মন কোন প্রকারে প্রবোধ মানিল না। তিনি আবার কহিলেন,—"মহারাজ, কি ছার প্রবোধ বাক্যে তুমি

আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছ ? কা'ল এই পুরীতে প্রবীর আমার সর্ব্বময়, আজ হেথায় প্রবীরহন্তার আগমনে আনন্দোৎসব ! কা'ল এই নগর প্রবীরের জয়গৌরবে উদ্ভাসিত প্রবীরের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হইয়াছিল, আজ সে নগর প্রবীর-হন্তার সম্মানে আলোকমালায় বিভূষিত; প্রবীরহন্তার স্তুতিগানে নিনাদিত!—কা'ল হেথায় মাহিষ্মতীরাজ বিজয় গৌরবে দীপ্ত পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, আজ তিনি সমরক্ষেত্রে নিপতিত পুত্রদেহের স্মৃতি ভুলিয়া পুত্রহন্তার পূজায় ধন্য হইতেছেন ! কোন্ জননী, মৃত পুত্রের স্মৃতির এই দারুণ অবমাননা সহ্য করিতে পারে ! মহারাজ, তুমি স্বামী, তোমার আনুগত্য আমার প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু আমি প্রবীরের জননী। পুত্রের প্রতিও আমার কর্ত্তব্য আছে। ক্ষত্রিয়নারী, ক্ষত্রিয় ধর্ম্মত্যাগী স্বামীর আনুগত্যের জন্য, ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পালনে ক্ষত্রিয় গৌরবে গৌরবান্বিত পুত্রের অবমাননা করিতে পারে না। তোমার মহিষী বলিয়া, ক্ষত্রিয়নারী আমি, আমার গৌরবের কিছুই নাই, কিন্তু প্রবীরের জননী বলিয়া আমি জগতে চির গৌরবিনী রহিব। মাহিষ্মতী-রাজবংশের উজ্জ্বলতম রত্ন, মাহিষ্মতী গগনের প্রদীপ্ত সূর্য্য প্রবীর আমার—আপন গৌরবে আপন মহত্ত্বে মাহিষ্মতী রাজ্য চির-স্মরণীয় করিয়া—মাহিষ্মতী রাজকুলের সম্মান রক্ষার্থে সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া—যে মাহিষ্মতী পুরীতে আজ এত উপেক্ষিত, এত অপমানিত,—প্রবীরজননী জনা আর একমুহূর্ত্তও সে পুরীর আশ্রয় চাহে না। এখনই তোমার পাপপুরী আমি ত্যাগ করিয়া

যাইব। প্রবীরের অভিশাপ লইয়া—পুত্রহারা—মৃত বীরপুত্রের স্মৃতির এরূপ অবমাননায় দগ্ধপ্রাণা জননীর অভিশাপ লইয়া—একা তুমি এ পুরীতে বাস কর।”

উন্মাদিনীর ন্যায় জনা পতিগৃহ ত্যাগ করিলেন; একাকিনী বিজন বনাভিমুখে ছুটিয়া চলিলেন। কেহ তাঁহাকে ফিরাইতে পারিল না। আহার নিদ্রা বর্জ্জিতা জনা, দিনের পর দিন বিজন বনভূমি অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলেন।

অবশেষে গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া, গঙ্গাজলে দেহ বিসর্জ্জন করিয়া মহীয়সী জনা ইষ্টদেবীর কোলে চিরশান্তি লাভ করিলেন।

চিন্তা ও ভদ্রা।

(১)

পূর্ব্বকালে শ্রীবৎস নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। পরম ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী বলিয়া ইঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। সর্ব্বগুণে গুণবতী পতিপ্রাণা সতী চিন্তা ইঁহার মহিষী।

কে বড়, এই কথা লইয়া শনি ও লক্ষ্মী দুই জনের মধ্যে দেবলোকে বিবাদ উপস্থিত হইল। মীমাংসার জন্য উভয়ে শ্রীবৎস রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবতার বিবাদের মীমাংসা,—যিনি অসন্তুষ্ট হইবেন তিনিই সর্ব্বনাশ করিবেন,—শ্রীবৎস বড় বিষম সমস্যায় পড়িলেন। কহিলেন,—"কা'ল আপনারা আসিবেন, যথাসাধ্য ইহার মীমাংসা আমি করিব।"

অনেক চিন্তা করিয়া শ্রীবৎস এই সমস্যা পূরণের এক উপায় স্থির করিলেন। তিনি নিজ সিংহাসনের ডা'নদিকে এক খানা সোণার আসন এবং বাঁ দিকে একখানা রূপার আসন রাখিয়া লক্ষ্মী ও শনির আগমনের প্রতিক্ষা করিতে লাগিলেন। শনি ও লক্ষ্মী আসিলে, শ্রীবৎস উঠিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন। আপন ইচ্ছায় লক্ষ্মী ডা'নদিকে সোণার আসনে এবং শনি বামদিকে রূপার আসনে বসিলেন।

বসিয়া দুইজনে কহিলেন,—"মহারাজ, এখন আমাদের এই বিবাদের মীমাংসা কর।"

শ্রীবৎস কহিলেন,—"স্থান ও আসন নির্ব্বাচনে আপনারা নিজেরাই, কে বড়, কে ছোট, তাহার মীমাংসা করিয়াছেন। আমার কোন বক্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

লজ্জিত ও অপমানিত শনি যার-পর-নাই ক্রুদ্ধ হইলেন। একে শনি, তাহাতে আবার সভায় সকলের সমক্ষে এই অপমান। রুষ্ট শনি শ্রীবৎসকে ইহার উপযুক্ত প্রতিশোধ দিতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন।

কোন সূত্রে শনি শ্রীবৎসকে আশ্রয় করিলেন। শনি একবার কাহাকেও আশ্রয় করিলে বার বৎসর তাহাকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। শ্রীবৎসেরও লাঞ্ছনা আরম্ভ হইল। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভূমিকম্প প্রভৃতি নানা উৎপাতে তাঁহার রাজ্য ছারখার হইল। শ্মশান স্বরূপ রাজ্য ত্যাগ করিয়া শ্রীবৎস বনে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন।

কিন্তু রাণী চিন্তা কি, বনবাসের এত কষ্ট সহিতে পারিবেন ? শ্রীবৎস তাঁহাকে তাঁহার পিতৃগৃহে পাঠাইতে চাহিলেন।

কিন্তু চিন্তা কহিলেন,—"এক সময় তোমার রাণী হইয়া গৌরবে পিতার গৃহে গিয়াছি। আজ কাঙ্গালিনীর ন্যায় পিতার আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া তোমার মুখ ছোট করিতে পারিব না। আর, দুঃখের সময় তোমাকে একা ফেলিয়া কোন্ ছার সুখের জন্য আমি পিতার গৃহে যাইব ? এই বিপদে তোমার যে গতি,

আমারও সেই গতি। তোমার কাছে থাকিয়া তোমার সেবা করিব,—যে টুকু পারি তোমার দুঃখের লাঘব করিব। যতই দুঃখ পাই, দুইজনে একসঙ্গে থাকিলে সব সহিতে পারিব,—দুঃখও তখন সুখ বলিয়া মনে হইবে।”

একেবারে অনাহারে ও অনাশ্রয়ে না মরিতে হয়, এই জন্য কিছু ধন রত্ন, সোণারূপা এবং নিতান্ত আবশ্যকীয় জিনিসপত্রের একটা পুটলী বাঁধিয়া নিয়া গভীর রাত্রে রাজা রাণী পুরীত্যাগ করিয়া গেলেন।

যাইতে যাইতে দুইজনে নদীর পাড়ে আসিলেন। কি প্রকারে নদী পার হইবেন এই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় একখানা ছোট ডিঙ্গি-নৌকা লইয়া শনি এক মাঝির রূপ ধরিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। শ্রীবৎস পার হইতে চাহিলে মাঝি কহিল,—“আমার যে নৌকা তাহাতে অতবড় পুঁটলী লইয়া তোমরা দু’জনে উঠিলে নৌকা ডুবিয়া যাইবে।”

শ্রীবৎস কহিলেন,—“তবে আগে পুঁটলী রাখিয়া আইস, পরে আমাদের নিয়া যাইবে।” এই বলিয়া রাজা পুঁটলী নৌকায় তুলিয়া দিলেন। মাঝিরূপী শনি পুঁটলী লইয়া অন্তর্হিত হইল।

নিসংম্বল হইয়া রাজা ও রাণী বনে বনে ঘুরিতে লাগিলেন। একদিন ক্ষুধায় বড় কাতর রাজা, খুঁজিতে খুঁজিতে একটি মাছ পাইলেন। মাছটি পোড়াইয়া দিবার জন্য রাণীকে বলিলেন। চিন্তা মাছ পোড়াইয়া, ছাই ধুইবার নিমিত্ত নিকটে

এক পুকুরে গেলেন। কিন্তু যেমন মাছটি জলে ধরিলেন, পোড়ামাছ প্রাণ পাইয়া জলে পলাইয়া গেল। চিন্তা কাঁদিয়া আকুল হইলেন। রাজা এখন কি খাইবেন? এতকষ্টে যদি একটি মাছ পাওয়া গেল, তা'ও এইভাবে গেল। পোড়ামাছ প্রাণ পাইয়া জলে যায়, কে কবে দেখিয়াছে, কে কবে শুনিয়াছে? ছি ছি, রাজা কি মনে করিবেন? তিনি হয়তো ভাবিবেন, ক্ষুধার জ্বালায় চিন্তা নিজেই সে মাছ খাইয়া ফেলিয়াছে। লজ্জায়, দুঃখে ও ভয়ে চিন্তা কাঁদিতে কাঁদিতে রাজার কাছে গিয়া সব কথা বলিলেন। শুনিয়া রাজা আর কিছু বলিলেন না; রাজা বুঝিতে পারিলেন, ইহাও শনির চক্রান্ত।

কিছুদিন বনে থাকিয়া,—শ্রীবৎস দেখিলেন, বনে সর্ব্বদা আহার যোটে না। গ্রামে কি নগরে কোন কাজকর্ম্ম করিয়া আপনাদিগকে প্রতিপালন করিবেন, এই মনে করিয়া দুইজনে বন ত্যাগ করিলেন। কোন নদীর পাড়ে এক কাঠুরিয়াদের গ্রামে রাজা কাঠুরিয়া হইয়া কাঠুরিয়াদের সঙ্গে কাঠ কাটিয়া কাঠ বেচিয়া নিজের ও স্ত্রীর ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুদিন কাটিল। একদিন এক সওদাগর পণ্যদ্রব্য পরিপূর্ণ নৌকা লইয়া ঐ গ্রামের নদী দিয়া যাইতেছিল। সহসা তাহার নৌকা চড়ায় ঠেকিয়া গেল। শনি গণকের বেশে সওদাগরের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"এই গ্রামে কাঠুরিয়াদের মধ্যে এক অতি সতী সাধ্বী স্ত্রী আছেন। তিনি স্পর্শ করিলেই নৌকা জলে ভাসিবে। আপনি কাঠুরিয়াদের

স্ত্রীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া এখানে আহার করাইবার আয়োজন করুন। সকলে আসিলে একে একে তাহাদিগকে নৌকা স্পর্শ করিতে বলিবেন।”

সওদাগর কাঠুরিয়াদের স্ত্রীদিগকে নিমন্ত্রণ করিল। সকলেই আসিল; কিন্তু চিন্তা আসিলেন না। রাজার রাণী হইয়া তিনি আজ নদীর পাড়ে সওদাগরের নিমন্ত্রণ খাইতে আসিবেন?

আহার করিয়া একে একে কাঠুরিয়ার স্ত্রীরা সকলেই নৌকা ছুঁইল, কিন্তু নৌকা ভাসিল না। তখন নৌকার যে মাঝি নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিল, সে বলিল,—“স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই। তিনি গৃহে আছেন। বোধ হয় তিনি স্পর্শ করিলেই নৌকা জলে ভাসিবে।”

সওদাগরের লোকজন যাইয়া, চিন্তাকে নৌকা ছুঁইতে অনেক অনুনয় করিল। চিন্তা ভাবিলেন, ‘ইহারা বিপদে পড়িয়া আমার শরণ লইয়াছে। বিপন্নের সাহায্যের জন্য আমাকে যাইতেই হইবে।’ স্বামী ঘরে ছিলেন না। তাঁহার আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই, চিন্তা গেলেন।

চিন্তা গিয়া ছুঁইবামাত্র নৌকা জলে ভাসিল। তখন দুর্ব্বৃত্ত সওদাগর ভাবিল—‘যদি আবার কখনো এইরূপ বিপদে পড়ি কে তখন রক্ষা করিবে?’ এই চিন্তা করিয়া সওদাগর বলপূর্ব্বক চিন্তাকে নৌকায় তুলিয়া লইল। চিন্তা কাঁদিয়া আকুল হইলেন। ধর্ম্মনাশের ভয়ে ভীত হইয়া চিন্তা সূর্য্যদেবকে ডাকিয়া কাতর-স্বরে কহিলেন,—“দেব! এ বিপদে তুমি আমার সহায় হও।

আমার ধর্ম্ম রক্ষার উপায় কর। আমাকে কুরূপা কর। যদি কখনো স্বামীর দেখা পাই, আবার আমার রূপ আমায় ফিরাইয়া দিও, নহিলে আজীবন কুরূপা হইয়াই থাকিব।”

সূর্য্যদেবের কৃপায় কুরূপা হইয়া চিন্তা সওদাগরের নৌকায় বন্দিনী হইয়া রহিলেন।

কুটীরে ফিরিয়া চিন্তাকে না দেখিয়া এবং সওদাগর চিন্তাকে হরণ করিয়াছে, তাহা শুনিয়া, শ্রীবৎস বড় কাতর হইলেন। দারুণ দুঃখে কাঠুরিয়াদের গ্রাম ত্যাগ করিয়া শ্রীবৎস আবার বনে চলিয়া গেলেন। বনে দৈবানুগ্রহে অনেক সোণা পাইয়া সেই সোণা দিয়া তিনি অনেক পাট গড়িলেন। একদিন নদীর পাড়ে বসিয়া পাট গড়িতেছেন, এমন সময়, সেই সওদাগর নৌকা লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইল। শ্রীবৎস সওদাগরকে কহিলেন, “আমার অনেক সোণার পাট আছে, তোমার নৌকায় আমাকে লইয়া চল। কোন নগরে আমি এই পাটগুলি বিক্রয় করিব।” সওদাগর স্বীকৃত হইল। সমস্ত পাট নৌকায় তুলিয়া শ্রীবৎস সেই নৌকায় উঠিলেন।

অতগুলি সোণার পাট দেখিয়া পাপবুদ্ধি সওদাগরের লোভ হইল। পাট গুলি লাভ করিবার আশায় সেই প্রকাণ্ড নদীর মাঝখানে সওদাগর শ্রীবৎসকে জলে ফেলিয়া দিল। জলে পড়িয়া, “কোথায় চিন্তা, তোমাকে আর দেখিলাম না” বলিয়া শ্রীবৎস কাঁদিয়া উঠিলেন। নৌকার অপর প্রান্তে বন্দিনী চিন্তা শ্রীবৎসের কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। মুখ

বাড়াইয়া দেখিলেন, স্বামী সেই অকূল নদীর জলে ডুবিয়া যাইতেছেন। স্বামীকে ডাকিয়া চিন্তা একটা বালিশ ফেলিয়া দিলেন। বিকৃত রূপ সত্বেও শ্রীবৎস বুঝিতে পারিলেন, চিন্তা ঐ নৌকায় আছেন। পাল তুলিয়া তীরবেগে নৌকা চলিয়া গেল। শ্রীবৎস বালিশ ধরিয়া জলে ভাসিতে ভাসিতে অনেক কষ্টে তীরে উঠিলেন। কিছুদিন পরে সৌতিপুরে এক মালীর গৃহে শ্রীবৎস আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মালীর স্ত্রী শ্রীবৎসকে ভাগিনেয় ডাকিয়া তাঁহাকে অনেক স্নেহ করিতে লাগিল।

(২)

সৌতিপুরে রাজা বাহুদেবের ভদ্রা নামে পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। ভদ্রা শ্রীবৎসকে স্বামী পাইবার আশায় অনেক দিন শিবদুর্গার আরাধনা করিয়া মনোমত বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বাহুদেব ভদ্রার স্বয়ম্বর ঘোষণা করিলেন। নানাদেশের রাজগণ সৌতিপুরে আসিলেন। ভদ্রা শ্রীবৎসকে কখনো দেখেন নাই। নাম শুনিয়া তাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। স্বয়ম্বরসভায় রাজগণ সমবেত হইলেন। মালীর আশ্রিত দীন হীন শ্রীবৎস স্বয়ম্বর দেখিবার জন্য সভার নিকটবর্ত্তী এক কদম্ব গাছের তলে বসিয়া রহিলেন।

বিভিন্ন রাজগণের পরিচয় ঘোষণা হইল। কিন্তু শ্রীবৎস নাই; ভদ্রা বড় বিপদে পড়িলেন। একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"সভাস্থ সকলে আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। পূর্ব্বে

কোন মহাপুরুষের নাম শুনিয়া আমি তাঁ'কে পতিত্বে বরণ করিয়াছি। আজ এই সভায় তাঁহাকে দেখিতে পাইব আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁ'কে দেখিতে পাইতেছি না। ব্রাহ্মণগণ আশীর্ব্বাদ করুন, যদি এখানে কোথাও ছদ্মবেশে তিনি থাকেন, তবে যেন আমি চিনিতে পারি। আকাশে দেবগণ আমার প্রার্থনা শুনুন, আমার স্বামীকে দেখাইয়া দিয়া অবলার ধর্ম্ম রক্ষা করুন।"

তখন দৈববাণী হইল,—"ওই কদম্বতলায় দীনবেশে যিনি বসিয়া আছেন, তিনিই তোমার স্বামী।"

ভদ্রা কদম্বতলায় গিয়া শ্রীবৎসের গলে বরমাল্য অর্পণ করিলেন।

দীন হীন অজ্ঞাত পুরুষকে স্বামীত্বে বরণ করায় ভদ্রার পিতা ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইলেন। অন্তঃপুরে গিয়া রাণীর কাছে এই দুঃখের ও অপমানের কথা বলিয়া—ভদ্রাকে ত্যাগ করিবার বাসনা জানাইলেন। বুদ্ধিমতী রাণী রাজাকে বুঝাইয়া কহিলেন,—"পৃথিবীতে ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব ঘটনা হয়।—তা'র জন্য ক্রোধে কেন মহারাজ? ভদ্রাকে তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই বুদ্ধি দিয়াছেন। তাঁ'র ইচ্ছায়, তাঁ'র প্রদত্ত বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া ভদ্রা যে পুরুষকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে,—ঈশ্বরের ইচ্ছায় সে-ই ভদ্রার স্বামী। জামাতারূপে আমাদেরও তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। মায়ার মোহে ভুলিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিকূলে কাজ করিয়া অধর্ম্মের ভাগী হইও না।"

রাজাকে বুঝাইয়া রাণী বাহিরে ভদ্রার নিকটে গেলেন। সেই কদম্বতলে তখনো ভদ্রা মুগ্ধনেত্রে শ্রীবৎসের দিকে চাহিয়া—দাঁড়াইয়া আছেন। মধুর দৃশ্যে মহাপ্রাণা রাণীর মন মুগ্ধ হইল। তিনি কন্যা জামাতাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদের মস্তক চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কিন্তু রাজার ক্রোধ একেবারে গেল না। তিনি পুরীর বাহিরে একস্থানে কন্যাজামাতার থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

ভদ্রার মত স্ত্রীরত্ন লাভেও শ্রীবৎস সুখী হইতে পারিলেন না। চিন্তার চিন্তা তাঁহাকে অবিরত দগ্ধ করিতে লাগিল।

রাজা হইয়া শ্বশুরগৃহে শ্বশুরের অন্নে প্রতিপালিত হইতেছেন, এ অবস্থাও তাঁ'র বিষময় বোধ হইতে লাগিল। ভদ্রা বরমাল্য দিয়াছেন, তাই তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু চিন্তাকে ভুলিয়া ভদ্রাকে তিনি হৃদয়ে স্থান দিতে পারিলেন না। কিন্তু ভদ্রার তাহাতে কোন দুঃখ নাই। স্বামীকে প্রেমে ও ভক্তিতে সুখী করিবেন, এই মাত্র তাঁহার বাসনা; প্রতিদানে স্বামীর প্রেম তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না। শ্রীবৎসের মনের অবস্থা জানিয়া স্বামীর দুঃখে দুঃখিনী ভদ্রা, স্নেহবাক্যে সর্ব্বদা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেন।

ক্রমে দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইল। রাজার শনির ভোগের কাল গত হইল। কিন্তু চিন্তাকে তিনি কোথায় কি প্রকারে পাইবেন? যদি কখনো সেই সওদাগর নৌকাসহ এই নগরে

আসে, এই আশায় শ্রীবৎস দিবারাত্রি নদীর তীরে বসিয়া থাকিতেন।

একদিন সত্য সত্যই সেই সওদাগর, সেই তা'র নৌকা, সেই তা'র নৌকায় বন্দিনী চিন্তাকে লইয়া সৌতিপুরে আসিল। শ্রীবৎস নৌকা আটক করিয়া চিন্তাকে উদ্ধার করিলেন। স্বামীকে পাইয়া সূর্য্যদেবের কৃপায় কুরূপ ছাড়িয়া চিন্তা আবার সুরূপা হইলেন। ভদ্রা ভক্তিভরে চিন্তাকে প্রণাম করিলেন। ভগিনী বলিয়া চিন্তাও তাঁহাকে স্নেহভরে বুকে লইলেন।

শ্রীবৎসের পরিচয় পাইয়া বাহুদেব লজ্জিত হইয়া পরম সমাদরে জামাতাকে রাজপুরীতে আনয়ন করিলেন। শনিমুক্ত রাজা শ্রীবৎস লক্ষ্মীর কৃপায় আবার রাজ্যেশ্বর হইয়া, চিন্তা ও ভদ্রাকে লইয়া নিজরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন।

শৈব্যা।

স্বামীর ধর্ম্মরক্ষার জন্য পতিব্রতা আর্য্যনারী যে, কতদূর পর্য্যন্ত কষ্ট স্বীকারে প্রস্তুত হন, শৈব্যা তাহার শ্রেষ্ঠ

শৈব্যা, রামচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ সূর্য্যবংশীয় অযোধ্যারাজ হরিশ্চন্দ্রের মহিষী। কোন কারণে মহর্ষি বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের উপর বড় কুপিত হন। বিশ্বামিত্রের কোপ-শান্তির নিমিত্ত হরিশ্চন্দ্র প্রতিজ্ঞা করিলেন,—বিশ্বামিত্র যাহা কহিবেন তাহাই দিয়া তাঁহার কোপশান্তি করিবেন।

বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের নিকট তাঁহার রাজ্যসহ সমস্ত ধন চাহিলেন। চাহিবামাত্র হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দান করিলেন। দক্ষিণা বিনা দান সিদ্ধ হয় না, তাই বিশ্বামিত্র এতবড় রাজ্যদানের দক্ষিণা স্বরূপ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা চাহিলেন।

সর্ব্বস্ব দান করিয়া হরিশ্চন্দ্র কপর্দ্দকশূন্য হইয়াছেন, এখন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা কোথায় পাইবেন? তিনি বিশ্বামিত্রের নিকট একমাস সময় প্রার্থনা করিয়া, কাশীতে গেলেন।

স্বামীর সুখ দুঃখের,—সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের,—মঙ্গল অমঙ্গলের চিরসঙ্গিনী শৈব্যা, শিশুপুত্র রোহিতাশ্ব সহ স্বামীর অনুগামিনী হইলেন। হরিশ্চন্দ্র ক্ষত্রিয় রাজা, লোককে দান করিয়াছেন ছাড়া

কখনো কাহারো কাছে ভিক্ষাপ্রার্থী হন নাই। তাই দানের দক্ষিণা সংগ্রহের জন্য ভিক্ষা করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। অন্য কোন উপায়েও এক মাসের মধ্যে প্রতিশ্রুত দক্ষিণার সহস্র স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। একমাস উত্তীর্ণ হইল। বিশ্বামিত্র দক্ষিণার জন্য কাশীতে উপস্থিত হইলেন।

হরিশ্চন্দ্র অকূল সমুদ্রে পড়িলেন। যে প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্য রাজ্যদান করিয়া আজ ভিখারী সাজিয়াছেন, সেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পাপেই তাঁহাকে পড়িতে হইল। চিন্তায় হরিশ্চন্দ্র উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। তখন শৈব্যা কহিলেন,—"মহারাজ, যে প্রকারেই হউক, প্রতিজ্ঞারক্ষা—ধর্ম্মরক্ষা—তোমায় করিতেই হইবে। ইহার জন্য যে কোন ক্লেশ পাইতে হয়, তা'তেই আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। আমি তোমার স্ত্রী, তোমার দাসী,—আমার উপর তোমার সব অধিকারই আছে। তুমি দাসীরূপে আমায় বিক্রয় কর। যদি তা'তেও না হয়,—তবে দাসরূপে নিজে বিক্রীত হও। এই বিক্রয়লব্ধ অর্থে—বিশ্বামিত্রের ঋণ পরিশোধ কর।"

স্ত্রীপুত্র বিক্রয়ের কথায় হরিশ্চন্দ্রের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আজ কোন্ প্রাণে তিনি শৈব্যার মত স্ত্রীরত্ন, রোহিতের মত পুত্ররত্ন বিক্রয় করিবেন? রাজরাণী শৈব্যা, হরিশ্চন্দ্রের প্রাণস্বরূপিনী শৈব্যা, আজ কোন্ নিষ্ঠুর দানবের অধিকৃত হইবে? সে কি শৈব্যার যত্ন করিবে? সে কি শৈব্যার মান রাখিবে? হরিশ্চন্দ্রের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল

শৈব্যা আবার তাঁহাকে বুঝাইয়া কহিলেন,—"পুরুষ হইয়া, বীর হইয়া—মহাপ্রাণ হইয়া—কেন তুমি আজ এত কাতর হইতেছ ? দুঃখ যতই বড় হউক, ধর্ম্মরক্ষার জন্য তোমার মত পুরুষের কি তা'তে কাতর হওয়া উচিত ? সূর্য্যবংশধর হইয়া—আজ কি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ পাপে পাপী হইবে ? আমার জন্য কোন চিন্তা করিও না। তোমার ধর্ম্ম, তোমার মান অপেক্ষা পৃথিবীতে কিছুই আমার বড় নয়। তোমার ধর্ম্মরক্ষা হইল, এই চিন্তায় এই সান্ত্বনায় সকল দুঃখ আমি অকাতরে সহিব। তোমার মত মহাপুরুষ আমার স্বামী, এই গৌরবে সকল লাঞ্ছনা, সকল অপমানের মধ্যেও আমি আপনাকে গৌরবিনী মনে করিব। তুমি ভাবিও না, কাঁদিও না। দুঃখের ভয় আমি করি না ; আর, এ পৃথিবীতে কাহারও সাধ্য নাই যে, হরিশ্চন্দ্রমহিষী শৈব্যার নারী-ধর্ম্মের অবমাননা করিতে পারে।"

হরিশ্চন্দ্র—স্ত্রীপুত্র ও নিজেকে বিক্রয় করিয়াও প্রতিশ্রুত দক্ষিণা সংগ্রহে প্রস্তুত হইলেন। ইচ্ছা ছিল, যদি কোন সহৃদয় ধনী ব্যক্তি তাঁহাদের তিনজনকেই এক সঙ্গে ক্রয় করেন, তাহা হইলে দাস দাসীরূপেও তাঁহারা একত্র থাকিতে পারিবেন। কিন্তু এমন ক্রেতা মিলিল না। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রায় শৈব্যাকে ক্রয় করিলেন। শিশুপুত্র মাতৃহীন হইয়া কোথায় থাকিবে, শৈব্যা রোহিতাশ্বকেও সঙ্গে ক্রয় করিবার জন্য ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করিলেন। বালক দাসের প্রয়োজন নাই বলিয়া ব্রাহ্মণ অস্বীকার করিলেন। শৈব্যা কহিলেন,—"ঠাকুর,

ইহাকে যদি ক্রয় না করেন, তবে অগত্যা আমার সঙ্গে ইহাকে লইতে অনুমতি করুন। বালক আমা-ছাড়া একদিনও বাঁচিবে না।”—

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—“ইহাকে সঙ্গে নিতে আর কোন আপত্তি আমার নাই। কিন্তু অনর্থক দু’জনের আহার আমি যোগাইতে পারিব না।”

শৈব্যা কহিলেন,—“ঠাকুর, আপনি সেজন্য কোন চিন্তা করিবেন না। আমাকে যা’ আহার দিবেন, তা’ই আমরা দু’জনে ভাগ করিয়া খাইব।”

ব্রাহ্মণ আর আপত্তি না করিয়া পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা দিয়া রোহিতাশ্ব সহ শৈব্যাকে লইয়া গেলেন।—হরিশ্চন্দ্র কাশীর শশ্মান-চণ্ডালের নিকট তাহার সহকারী দাসরূপে আপনাকে বিক্রয় করিয়া বাকী আর পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করিয়া, বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা দিলেন।

আত্মবিক্রয়, স্ত্রীপুত্র বিক্রয়ের পর ত্যাগ আর হইতে পারে না। এই অতুল অপূর্ব্ব ত্যাগে আর্য্যবীর আপনার প্রতিজ্ঞাপালন করিলেন।

শৈব্যা সেই ব্রাহ্মণগৃহে পুত্র সহ অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ শৈব্যাকে মাত্র তাঁহার নিজের যোগ্য আহার দিতেন। শৈব্যা পেট ভরিয়া রোহিতকে খাওয়াইয়া—যা’ কিছু অবশিষ্ট থাকিত, তা’ই নিজে খাইতেন। অল্পাহারে, কঠোর দৈনিক শ্রমে শৈব্যা কঙ্কালসার হইলেন। স্বামীর ধর্ম্ম-

রক্ষার্থে পতিব্রতা রাজমহিষী সন্তুষ্টচিত্তে সব সহ্য করিতে লাগিলেন।

রোহিতাশ্ব ব্রাহ্মণের পূজার ফুল তুলিত। একদিন ফুল তুলিবার সময় বিষধর সর্পে তাহাকে দংশন করিল। বালক দৌড়িয়া মা'র কোলে আসিয়াই ঢলিয়া পড়িল।

দিন ভরিয়া শৈব্যা পুত্রকোলে করিয়া বসিয়া কাঁদিলেন। দাসীপুত্র, কে তাহার সৎকার করিবে?— রাত্রিতে ব্রাহ্মণ, শৈব্যাকে, শ্মশানে নিয়া পুত্রের সৎকার করিতে আদেশ করিলেন।

রাত্রি অন্ধকার, তাহাতে ভয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল। একাকিনী শৈব্যা মৃতপুত্র কোলে করিয়া শ্মশানে চলিলেন। সে দৃশ্য বড় করুণ,—সে দৃশ্য বর্ণনার অতীত।

কিন্তু দুঃখের চরমসীমায় উপস্থিত হইয়া—শৈব্যার অদৃষ্ট ফিরিল। শ্মশানে হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে শৈব্যার সাক্ষাৎ ঘটিল। শ্মশান-চণ্ডাল মহারাজা হরিশ্চন্দ্র, পরদাসী মহারাণী শৈব্যা, দুইজনে সেই ভীষণ রাত্রিতে কাশীর সেই ভীষণ শ্মশানে, মৃতপুত্র কোলে লইয়া, শোকের আগুনে শোকের আগুন মিলাইয়া,— সেই আগুনে দ্রবপ্রাণের দুঃখের অশ্রু, মিলনের অশ্রু, সহানুভূতির অশ্রু ঢালিতে লাগিলেন। আহা! এমন পুণ্য-অশ্রু জগতে কবে কে কোথায় ফেলিয়াছে,—কে কোথায় দেখিয়াছে? এই অশ্রুতে কাশীর শ্মশান পবিত্র হইল, শোক নিভিল, ক্রোধ নিভিল,—সব দুঃখ—অদৃষ্টের সব মলিনতা ধৌত হইল।

ধর্ম্ম পালনের জন্য হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যার দুঃখের চরম সীমায় আজ এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়া বিশ্বামিত্র স্তম্ভিত হইলেন। হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম্ম পরীক্ষার জন্যই তিনি হরিশ্চন্দ্রের প্রতি এত নিষ্ঠুরতা দেখাইয়াছেন,—ধর্ম্মবীরের ধর্ম্মবলে তিনি আজ মুগ্ধ হইলেন।

স্বয়ং ধর্ম্মদেবতা সহ তিনি শ্মশানে উপস্থিত হইয়া রোহিতাশ্বের জীবন দান করিয়া হরিশ্চন্দ্রকে তাঁহার রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন। মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের, মাহারাণী শৈব্যার, আজ সকল দুঃখের পুরস্কার হইল।

সুমিত্রা।

লক্ষ্মণ-জননী সুমিত্রার অতুলনীয় আত্ম-বিস্মৃতি ও আত্ম-ত্যাগের কথা কি কেহ কখনো চিন্তা করিয়া থাকেন? রামায়ণ পড়িয়া কৌশল্যার ও সীতার কথা, কৈকেয়ী ও মন্থরার কথা আমরা অনেক আলোচনা করিয়া থাকি। কিন্তু মহানুভবা, মানবীরূপে দেবী, সুমিত্রার কথা,—কই, কাহাকেও বড় আলোচনা করিতে শুনি না।

আপন মহিমা আপন হৃদয়ে লুকাইয়া সমুদ্র-তলে লক্ষ্মীর ন্যায়, মহাকাব্য রামায়ণের এক কোণে যেন সুমিত্রাদেবী লুকাইয়া রহিয়াছেন। আত্ম-বিস্মৃতা সুমিত্রাকে কবিও যেন বিস্মৃত হইয়াছেন। রামের সুখে সুখ, দুঃখে দুখ, মঙ্গলে মঙ্গল, অমঙ্গলে অমঙ্গল মনে করিয়া একেবারে আপনাকে ভুলিয়া লক্ষ্মণ যেমন জীবন ভরিয়া রামেরই সেবা করিয়াছেন, জননী সুমিত্রাও তেমনি একেবারে আপনাকে ভুলিয়া সপত্নী ও সপত্নী-পুত্রের গৌরবের জন্যই যেন জীবন ধারণ করিতেন।

জ্যেষ্ঠা মহিষী ও গৃহিণী বলিয়া দশরথ কৌশল্যাকে সম্মান করিতেন, রূপবতী বলিয়া কৈকেয়ীর অনুগত হইয়া থাকিতেন, কিন্তু সুমিত্রার প্রতি কখনো তেমন স্নেহ প্রদর্শন করেন নাই। পতির স্নেহে বঞ্চিতা হইয়াও সুমিত্রা কখনো সপত্নী কৌশল্যা ও কৈকেয়ীর প্রতি ঈর্ষ্যান্বিতা হন নাই।—প্রাণাধিক পুত্রদ্বয়

লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন চিরদিন রাম ও ভরতের অনুগত হইয়া দাসের ন্যায় তাঁহাদের সেবা করিয়াছেন, সুমিত্রা তাহাতে কখনো দুঃখ প্রকাশ করেন নাই, বরং পুত্রদিগকে জ্যেষ্ঠের সেবায় রত থাকিতেই উপদেশ দিয়াছেন।

আহা, সুমিত্রার মত জননী না হইলে কি লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নের মত পুত্র হয়?

রামের বনগমনের সংবাদে কৌশল্যা ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিলেন, দশরথকে নিন্দা করিলেন; কৌশল্যার রোদনে রাজপুরী ভরিয়া হাহাকার উঠিল। লক্ষ্মণও সুমিত্রার পুত্র;—বনগমনের সময় লক্ষ্মণ মাতার চরণে প্রণাম করিলে, ধীর প্রশান্ত মনে সুমিত্রা কহিলেন,—"পুত্র, তুমি বাল্যাবধিই রামের অত্যন্ত অনুরক্ত। আজ রামের সঙ্গে বনে যাইতেছ, আমি সন্তুষ্টচিত্তে তোমাকে অনুমতি দিতেছি। জ্যেষ্ঠের সেবাই কনিষ্ঠের ধর্ম্ম, আজ সেই ধর্ম্মপালন করিয়া তুমি ধন্য হও। বনমধ্যে রামের সেবায়, রামের রক্ষণে কোন কার্য্যেই পরাঙ্মুখ হইও না। ধর্ম্মপালন ও যুদ্ধে প্রাণত্যাগ বংশপরম্পরায় ইক্ষ্বাকুকুল-জাত বীরগণের ব্রত ও কর্ত্তব্য। আজ সেই ব্রত, সেই কর্ত্তব্য পালনে তোমার মতি হৌক্। রামকে দশরথের মত, সীতাকে আমার মত, সেই মহারণ্যকে অযোধ্যার মত মনে করিবে। যাও, পুত্র! সচ্ছন্দে বনগমন কর।"

"রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথা সুখম্॥"

এই সুন্দর শ্লোকটি লক্ষ্মণের প্রতি সুমিত্রার শেষ কথাগুলি।

রাম বনে গেলে কৌশল্যা ভূমিতে লুটাইয়া অবিরত রোদন করিতে লাগিলেন। পুরবাসিনীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া তাঁহার ক্রন্দনে ক্রন্দন মিশাইয়া বিপুল রাজপুরী আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। সুমিত্রাদেবী তখন কৌশল্যাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,—"দিদি, তোমার পুত্র সর্ব্বগুণশালী পুরুষ-শ্রেষ্ঠ রাম, পিতৃ সত্য পালনের জন্য হস্তগত রাজ্য ত্যাগ করিয়াও বনে গিয়াছেন। এই মহত্ত্বে জগতে তাঁ'র অক্ষয় কীর্ত্তি থাকিবে। তাঁহার নামে রঘুবংশ ধন্য হইবে। ইহা অপেক্ষা রামের আর কি কল্যাণ চাও? এমন পুত্র-ভাগ্যে ভাগ্যবতী হইয়া, পুত্রের মহত্ত্বে আনন্দিত না হইয়া কেন তুমি এমন দীনের ন্যায় কাঁদিতেছ? পতিব্রতা সীতা বনবাসের সমস্ত কষ্ট জানিয়াও ইচ্ছা করিয়া স্বামীর অনুগামিনী হইয়াছেন, তা'র জন্যই বা দুঃখ কি? তুমি সকলের বড়,—এই রাজগৃহের গৃহিণী; আজ উঠিয়া সকলকে সান্ত্বনা করিবে, না, তুমি আপনি কাঁদিয়া আকুল হইতেছ। এ কি দিদি তোমায় সাজে?

আর, তোমার ভয়ই বা কি? রামচন্দ্র মহাবীর। অস্ত্রচালনে তাঁ'র মত দক্ষ দ্বিতীয় পুরুষ নাই। মহাবীর ধনুর্দ্ধারী লক্ষ্মণ তাঁ'র সহায়। বনে তাঁ'র কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। এক সূর্য্য হইতে অপর সূর্য্য, এক অগ্নি হইতে অপর অগ্নি শ্রেষ্ঠ হইতে পারে, এক পৃথিবী অপর পৃথিবীর বড় হইতে পারে, এক দেবতা হইতে অন্য দেবতা বড় আছেন; শ্রী হইতে শ্রী, কীর্ত্তি হইতে কীর্ত্তি, ক্ষমা হইতে ক্ষমা, প্রাণী হইতে প্রাণী বড় হইয়া থাকে;

কিন্তু তোমার রাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মানব পৃথিবীতে হইতে পারে না। এমন রামের এই মহৎ আত্মত্যাগে মুগ্ধ হইয়া সূর্য্য আপনার তপ্ত কিরণে তাঁহাকে তাপ দিবেন না, বায়ু শীতে উষ্ণ ও গ্রীষ্মে শীতল হইয়া রামের সেবা করিবেন; চন্দ্রকিরণ পিতার ন্যায় নিদ্রিত রামকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে সুখী করিবেন। তুমি কাঁদিও না; কোন চিন্তা, কোন ভয় করিও না। পুত্রের মহত্ত্বের কথা স্মরণ করিয়া ধৈর্য্য ধর। চৌদ্দ বৎসর পর তোমার রাম নিরাপদে আবার তোমার কোলে ফিরিয়া আসিবেন।”

রামায়ণে সুমিত্রার কার্য্য ও কথা সম্বন্ধে আর কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু এই দুইটি কথাই সুমিত্রার মহৎচরিত্রের যথেষ্ট পরিচায়ক। রামায়ণের এই দুইটি কথাই চিরদিন সুমিত্রার গৌরব জগতে ঘোষিত করিবে। এই দুইটি কথাতেই সকলেই বুঝিতে পারিবেন, সুমিত্রা লক্ষ্মণের যোগ্য জননী।

সুকন্যা।

(১)

শর্ম্মিষ্ঠার ন্যায় পিতৃকুল ও পিতৃরাজ্য রক্ষার জন্য আত্মত্যাগের আর এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত শর্য্যাতি রাজার কন্যা সুকন্যা।

মহর্ষি চ্যবন এক বনে বহুদিন অবধি তপস্যা করিতেছিলেন। ক্রমে বল্মীক অর্থাৎ উইমাটিতে তাঁহার শরীর একেবারে ঢাকিয়া গেল। রাজা শর্য্যাতি, মহিষীগণ এবং একমাত্র কন্যা সুকন্যা ও অনুচরগণ সহ এক সময়ে সেই বনে আসিলেন।

সখীগণের সঙ্গে সুকন্যা বনের মধ্যে ইচ্ছামত ভ্রমণ করিতে-করিতে বল্মীক ও লতাগুল্মে আবৃত তপোনিরত চ্যবনের নিকট আসিলেন। বল্মীকপুঞ্জের কোন ভগ্ন স্থানের মধ্য দিয়া উজ্জ্বল মণির ন্যায় চ্যবনের চক্ষের জ্যোতিঃ বাহির হইতেছিল। কৌতূহল বশতঃ সুকন্যা মণি মনে করিয়া কাঁটা দিয়া চ্যবনের চক্ষু দুইটি বিদ্ধ করেন।

অন্ধ হইয়া চ্যবন অতিশয় কুপিত হইলেন। মুনির কোপে রাজার রাজ্য ধনরত্ন লোকজন সবই নষ্ট হইবার উপক্রম হইল। ভীত হইয়া রাজা, চ্যবনের স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন।

চ্যবন জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, তায় অন্ধ হইয়াছেন; তাঁহার সঙ্গে বিবাহ হইলেই রাজকন্যা সুন্দরী নবীনা যুবতী সুকন্যার উপযুক্ত শাস্তি হয়, তাই, চ্যবন সুকন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন।

রাজা বড় দুঃখিত হইলেন। কিন্তু পিতার বংশ, রাজ্য ও প্রজার মঙ্গলের জন্য, সুকন্যা অন্ধ ও জরাজীর্ণ বৃদ্ধ চ্যবনের হস্তে আত্মদান করিতে প্রস্তুত হইলেন। রাজা, চ্যবনের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিয়া রাজ্যে ফিরিয়া গেলেন।

স্বামী যেমনই হউন, স্ত্রীর দেবতা। তাঁহার সেবাই স্ত্রী-লোকের একমাত্র ধর্ম্ম। সুকন্যা রাজগৃহের ভোগবিলাস সব ভুলিয়া তপস্বিনী বেশে কায়মনোবাক্যে বৃদ্ধ স্বামীর সেবা করিতে লাগিলেন। একান্ত মনে স্বামীর সেবা, তপস্বী স্বামীর সঙ্গে তপশ্চারণ প্রভৃতিতে ক্রমে বনবাসী তপস্বীর তপোমহিমায় সুকন্যার হৃদয়-মন পূর্ণ হইল। তিনি যে, রাজকন্যা, তাহা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। রূপ-যৌবনের সম্ভোগ-বাসনা একেবারে তাঁহার মন হইতে দূর হইল। বৃদ্ধ তপস্বীর সহধর্ম্মিণী আজন্ম তপস্বিনীর ন্যায়—বনের শান্তিময় জীবনে সুকন্যা চিরতৃপ্তি লাভ করিলেন।

(২)

একদিন সূর্য্যপুত্র দেব-চিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সেই বনে আসিলেন। নবীনা তপস্বিনীর অপূর্ব্ব রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা সুকন্যার প্রণয়প্রার্থী হইলেন। অন্ধ ও জরাজীর্ণ বৃদ্ধ পতির সেবায় তিনি এমন দেবদুর্লভ যৌবন নিষ্ফল করিতেছেন, এইরূপ অনেক বুঝাইয়া তাঁহারা সুকন্যাকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সুকন্যা উত্তর করিলেন,—“দেবগণ! কেন ইতর নারীর

ন্যায় মনে করিয়া এসব কুকথা আমাকে বলিতেছেন ? ওই জরাজীর্ণ অন্ধ বৃদ্ধ স্বামীই আমার দেবতা। তাঁ'র সেবাতেই আমার জন্ম জীবন সার্থক ও সফল মনে করি। ধর্ম্ম পালনের সুখ ও শান্তিতে, তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট মনে আমি এই বনে বাস করিতেছি। এ সুখের কাছে ইন্দ্রিয়ভোগ কোন্ ছার ? আপনারা কখনো মনে করিবেন না যে, ইন্দ্রিয়ভোগের লালসায় আমার এই পতিসেবা-পরায়ণ পবিত্র হৃদয় কখনো বিচলিত হইবে।

সুকন্যার ধর্ম্মশীলতায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবচিকিৎসক অশ্বিনী-কুমারদ্বয় অন্ধ ঋষিকে চক্ষুদান করিলেন। বৃদ্ধ জরাজীর্ণ ঋষির দেহে দিব্য রূপ ও নবীন যৌবন সঞ্চারিত করিলেন।

সুকন্যার আত্মত্যাগ ও ধর্ম্মশীলতার পুরস্কার হইল।

পদ্মাবতী।

স্বামীর সত্য পালনের জন্য মহাপ্রাণা প্রাচীন আর্য্যনারী যে কত দূর পর্য্যন্ত আত্ম বিসর্জ্জন করিতে পারিতেন, মহারাণী শৈব্যার দৃষ্টান্তে পাঠিকারা তাহা দেখিয়াছেন। আর একটি দৃষ্টান্ত—পদ্মাবতীর চরিত্রে দেখুন।

নারী-প্রকৃতির সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম, মাতৃত্ব। এই মাতৃত্ব ধর্ম্মই জগতে সৃষ্টিরক্ষার প্রধান অবলম্বন। তাই বিধাতা নারী-হৃদয়ে এই ধর্ম্ম, এই শক্তি এত প্রবল করিয়া দিয়াছেন।

তাই মাতৃত্ব ধর্ম্মের বিসর্জ্জনে পুত্রের অমঙ্গল সাধন নারী-জীবনে একরূপ অসম্ভব কার্য্য বলিয়া মনে হয়। যিনি অসম্ভব সম্ভব করিতে পারেন, তিনি হয় দেবী, না হয় রাক্ষসী। যে নারী উচ্চ কর্ত্তব্য পালনের জন্য নারী-জীবনের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম মাতৃত্বের প্রবল শক্তিকে দমন করিয়া স্বহস্তে পুত্রের মুণ্ডচ্ছেদ করিতে পারেন, স্বহস্তে সেই পুত্রের মাংসদ্বারা অতিথি-সেবার আয়োজন করিতে পারেন, তাঁ'র মত আত্মত্যাগিনী জগতে দুর্ল্লভ। পদ্মাবতী, এই পুণ্য-ভারতভূমির সেই, জগতে-দুর্ল্লভ রত্ন।

এখন যেখানে ছোটনাগপুর প্রদেশ, প্রাচীন কালে সেই স্থানে অঙ্গরাজ্য ছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ে মহাবীর কর্ণ এই অঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। ছোটনাগপুর প্রদেশ একরূপ বাঙ্গালার মধ্যে। সুতরাং কর্ণ বাঙ্গালী রাজা এবং কর্ণের মহিষী

পদ্মাবতী বাঙ্গালী রাণী বলিয়া আমরা অনেক গৌরব করিতে পারি। কর্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্যোধনের একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। বীরত্বে অর্জ্জুন ব্যতীত ইঁহার সমকক্ষ আর কেহ ছিলেন না। এই অর্জ্জুনের সঙ্গেই ঘোরতর যুদ্ধের পর অর্জ্জুনের হস্তে কর্ণ প্রাণত্যাগ করেন।

কর্ণ একদিকে যেমন মহাবীর, অন্যদিকে তেমনি দাতা ও সত্যপরায়ণ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। প্রার্থীকে কখনো তিনি বিমুখ করিতেন না। একবার "দিব" বা "করিব" এইকথা বলিলে কিছুতেই তাহার ব্যতিক্রম করিতেন না।

একদিন দ্বাদশীর প্রভাতে, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"মহারাজ, আমি উপবাসী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ; পারণের জন্য আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। প্রার্থিত আহার্য্য দানে আমাকে পরিতৃপ্ত করুন। শুনিয়াছি আপনি প্রসিদ্ধ দাতা; প্রার্থীকে কখনো বিমুখ করেন না। তাই ইচ্ছামত আহার পাইব বলিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি।"

কর্ণ কহিলেন,—"কিসে আপনার পরিতৃপ্তি হইবে, বলুন, আমি তাহাই দিব।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"শুনিয়াছি মহারাজ কর্ণ একবার কাহাকেও 'দিব' বলিলে সে কথা কখনো প্রত্যাহার করেন না। তাই ভরসা করিয়া আমার আকাঙ্ক্ষা আপনাকে জানাইতেছি। কিন্তু যে আহারে আমার অভিরুচি, তাহা দেওয়া আপনার কষ্টকর হইতে পারে।"

কর্ণ হাসিয়া কহিলেন,—"আপনি সেজন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হইবেন না। আপনার প্রার্থিত আহার্য্য দানে আপনাকে পরিতৃপ্ত করিতে আমি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"প্রাণদান অপেক্ষাও কঠিন কার্য্য আছে।

কর্ণ কহিলেন,—"আমি তাহাতেও প্রস্তুত।"

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"আপনি নিজে ও আপনার মহিষী পদ্মাবতী, দুইজনে, করাত দ্বারা আপনার পুত্র বৃষকেতুকে কাটিয়া তাহার মাংস আমাকে খাইতে দিন্। রাণী নিজে সেই মাংস রাঁধিয়া দিবেন।"

কর্ণ বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কিছুকাল পরে কহিলেন,—"ব্রাহ্মণ, আপনি কে, জানি না। আপনার প্রার্থনা অমানুষিক। যাহাই হউক, নরমাংসেই যদি আপনার অভিরুচি হয়, আমি নিজের দেহ দান করিতেছি, এই মাংস আহারে তৃপ্তি লাভ করুন।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"আপনার বীরদেহের কঠিন মাংসে আমার তৃপ্তি হইবে না। শিশুর কোমল মাংসেই আমার অভিরুচি। যাহা চাহিয়াছি, তাহা দিবার যদি শক্তি না থাকে, তবে বলুন, আমি বিদায় হই।"

কর্ণের আজ বিষম পরীক্ষার দিন উপস্থিত। জীবন ভরিয়া যে সাধনা করিয়াছেন, যে ব্রত পালন করিয়া আসিয়াছেন, আজ তাহা ভঙ্গ হয়। ব্রাহ্মণের তৃপ্তির জন্য প্রাণ দান অপেক্ষাও কঠিন কার্য্য করিতে প্রস্তুত, মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেই তিনি এই কথা

বলিয়াছেন; তাঁ'র মুখের সেই কথা কি কেবল কথার কথা হইবে? লঘুচেতার বৃথা বাক্যের ন্যায় কি, তাঁহার মুখের কথাও বৃথা হইবে? পুত্রশোক তো বহুলোককেই সহ্য করিতে হয়;—তা'র ভয়ে কি,—বীর তিনি,—প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন?

কিন্তু, স্বহস্তে পুত্রের প্রাণ নাশ!—

পুত্রের প্রাণ নাশ?—যখন তিনি রাজ দণ্ড ধারণ করিয়াছেন, পুত্র তো তাঁহার প্রজা স্বরূপ। গুরুতর অপরাধ করিলে সাধারণ প্রজার ন্যায় নিজ পুত্রের প্রাণদণ্ড করিতেও তিনি ন্যায়ের বিধানে বাধ্য। রাজ দণ্ডের সম্মান রাখিতে যদি পুত্রের প্রাণদণ্ড করিতে হয়, তবে অতিথির সম্মান রাখিতে অঙ্গীকার-পালন-ধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখিতে, কেন তিনি পুত্রের শিরশ্ছেদ করিতে পারিবেন না? এক চিন্তা, পদ্মাবতী। ব্রাহ্মণ কি পদ্মাবতীকে এই মর্ম্মভেদী কঠোর যাতনাময় কর্ত্তব্যের দায় হইতে মুক্তি দিবেন না? কিছুকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া, কর্ণ ব্রাহ্মণকে কহিলেন,— "ঠাকুর, তাহাই হইবে। যখন অঙ্গীকার করিয়াছি, স্বহস্তে বৃষকেতুর মাংস কাটিয়া আপনাকে খাইতে দিব। কিন্তু একটি প্রার্থনা।—পদ্মাবতী রমণী—সহজে দুর্ব্বলা। রমণী সব কষ্ট সহিতে পারে কিন্তু পুত্রস্নেহ বিসর্জ্জন করিতে পারে না। বৃষকেতুর শোক সে বাধ্য হইয়া সহিবে; কিন্তু নিজের হাতে তাহাকে কাটা, আবার তাহার মাংস রাঁধিয়া দেওয়া এসব কি মাতার পক্ষে কখনো সম্ভব? তাই আমার কাতর প্রার্থনা,— পদ্মাবতীকে মার্জ্জনা করুন।"

ব্রাহ্মণ কঠোর বাক্যে কহিলেন,—"ধর্ম্মাচরণ সস্ত্রীক করিতে হয়। সুতরাং বৃষকেতুকে দুইজনে বলি দিবে। অথিতির সেবা গৃহিণীকে স্বহস্তে করিতে হয়, সুতরাং পদ্মাবতী নিজে মাংস রাঁধিয়া দিবেন। ইহা যদি তোমরা না পার, তোমার গৃহে আতিথ্য আমি গ্রহণ করিব না।"

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ উঠিলেন। কর্ণ নিরুপায় হইয়া ব্রাহ্মণকে বসিতে মিনতি করিলেন। ব্রাহ্মণ বসিলেন; কর্ণ অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

অন্তঃপুরে এক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে পালঙ্কের উপর পদ্মাবতী বসিয়া আছেন। বৃষকেতু পাশে দাঁড়াইয়া করযোড়ে, সে যে স্তোত্র শিখিয়াছে, তাহাই বলিতেছে। মুগ্ধনেত্রে পদ্মাবতী বালকের ভক্তি-উদ্ভাসিত নির্ম্মল প্রফুল্ল কান্তিপরিপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া অনন্যমনে সেই স্তোত্র শুনিতেছেন। এমন সময় কর্ণ ধীরপদে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। এ মধুর দৃশ্য দেখিয়া রাজা, কিছুকাল মাতাপুত্রের দিকে চাহিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহার কম্পিত গভীর দীর্ঘ নিশ্বাসে প্রসাদকক্ষ শব্দিত হইল, চমকিয়া পদ্মাবতী ফিরিয়া চাহিলেন।—চাহিয়া পদ্মাবতীর হৃদয় দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

পিতাকে দেখিয়া বৃষকেতু হাসিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কোলে উঠিয়া বলিল,—"বাবা, আমি স্তব পড়িতেছিলাম, তুমি শুনিয়াছ? কেমন, খুব ভাল পড়ি নাই?"

আত্মসম্বরণ করিয়া কর্ণ কহিলেন,—"হ্যাঁ বাবা, বেশ্

পড়িয়াছ, আমি শুনিয়াছি। ওই যে ধাত্রী আসিতেছে, যাও তুমি খাও গিয়া। পরে আবার স্তব শুনিব।"

ধাত্রী আসিল, বৃষকেতু আহারের জন্য তাঁর সঙ্গে গেল। পদ্মাবতী কহিলেন,—"কি হইয়াছে মহারাজ? সহসা তোমার মুখে এমন কালো ছায়া পড়িল কেন? অমন গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলে কেন?"—কর্ণ পালঙ্কের উপর বসিয়া পদ্মাবতীকে পাশে বসাইলেন। ধীরে ধীরে তাঁহাকে অতিথি ব্রাহ্মণের সকল কথা বলিলেন। শুনিতে শুনিতে পদ্মাবতী অবসন্ন হইয়া স্বামীর ক্রোড়ে লুটাইয়া পড়িলেন। তাঁহার চক্ষের দৃষ্টি, কর্ণের শ্রুতি, দেহের বল, মনের চিন্তা, প্রাণের সজীবতা সব যেন নিমিষে ফুরাইয়া গেল।

কর্ণ ডাকিলেন,—"পদ্মাবতী!"

পদ্মার উত্তর দিবার শক্তি নাই।

কর্ণ আবার বলিলেন,—"পদ্মাবতী, রাজার মহিষী তুমি, বীরের সহধর্ম্মিণী তুমি, হীনলোকের এই দুর্ব্বলতা কি তোমাকে সাজে? উঠ, বুক বাঁধ, আমার ধর্ম্মরক্ষার সহায় হও; আমার সহধর্ম্মিণী নাম সার্থক কর।"

পদ্মাবতী ধীরে ধীরে উঠিলেন। ধীরে ধীরে স্বামীর চরণতলে জানু পাতিয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন,—"স্বামী! প্রভু! দেবতা! তুমি আমায় বল দাও। আমি তোমা ভিন্ন দেবতা জানি না, তোমার সেবা ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম জানি না। আজ এই ভীষণ পরীক্ষায় তোমার চরণের আশ্রয় আমি চাহিতেছি। দুর্ব্বল রমণী,—হৃদয়ে বল দাও।

তোমার ধর্ম্মরক্ষার বড় আমার কিছুই নাই। কিন্তু হৃদয় ভাঙ্গিয়া আসিতেছে, দেহ অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, আশীর্ব্বাদ কর প্রভু!— নহিলে এ অধম নারী হ'তে তোমার ধর্ম্মরক্ষা হইবে না।"

কর্ণ কহিলেন,—"আমি কে পদ্মাবতী, যে এই কঠোর ব্রত-পালনে তোমাকে বল দিব? এ পরীক্ষায় আজ তুমি আমি দুইজনেই সমান দুর্ব্বল। বৃষকেতু তোমার আমার দু'জনেরই সমান প্রাণভরা স্নেহের ধন। আজ তাহাকে এই অতিথি ব্রাহ্মণের রাক্ষসী আকাঙ্খার নিকট বিসর্জ্জন দেওয়া তোমার আমার উভয়ের পক্ষেই সমান মর্ম্মভেদী যাতনা। বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের কৃপায় আমি কতক পরিমাণে বুক বাঁধিয়াছি। দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায়, সকল ধর্ম্মের আশ্রয়, সকল কর্ম্মের মূল শক্তি সেই ভগবান্‌কে ডাক। তিনিই বল দিবেন।"

পদ্মাবতী করযোড়ে ঊর্দ্ধনয়নে কাতর গদ্‌গদকণ্ঠে কহিলেন,—"নারায়ণ! বৈকুণ্ঠনাথ! বিশ্বদেব! তোমার এ কি লীলা—কিছুই বুঝি না প্রভু! জীবনে মরণে জীবের আশ্রয় তুমি, তুমি কি এই ব্রাহ্মণের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমার বৃষকেতুকে চাহিতেছ? তা' যদি হয় দেব, এই হীন প্রাণ মোহমুক্ত কর, তোমার সর্ব্বজীবের আশ্রয়রূপ দেখাও, নির্ম্মল দর্পণে উজ্জ্বল ছায়ার মত তোমার ইচ্ছা এই মোহমুক্ত প্রাণে প্রকাশ কর, তোমার ইচ্ছাপালনে দুর্ব্বল মন সবল কর।

নারীর নারীত্ব, মাতার মাতৃত্ব সব দূর করিয়া, একটি দিনের জন্য একমাত্র তোমার ইচ্ছানুগত, আত্মবিস্মৃত,—তোমার কার্য্যসাধনের নিমিত্তমাত্ররূপী জীবে আমায় পরিণত কর। নহিলে প্রভু, এ অধম নারী আজ এ দারুণ পরীক্ষায়—নারী-জীবনের একমাত্র দেবতা স্বামীর ধর্ম্মের সহায় হইতে পারে যে না!”

স্তিমিত লোচনে পদ্মাবতী ভগবান্ বিশ্বদেবতার ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়া, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া, ধীর প্রশান্তচিত্তে উঠিয়া কর্ণকে কহিলেন,—“যাও প্রভু, ব্রাহ্মণকে স্নানাহ্নিক করিতে বলিয়া আইস। যথাসময়ে তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত আহার দিব।”

তাহার পর কর্ণ ও পদ্মাবতী স্বহস্তে, করাত দ্বারা বৃষকেতুর মস্তক ছেদন করিলেন। পদ্মাবতী সেই মাংস নিজের হাতে রাঁধিয়া ব্রাহ্মণকে আহার করিতে আহ্বান করিলেন। ব্রাহ্মণ কর্ণকে কহিলেন,—“সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু আমি একা আহার করিব না। তুমি একটি বালককে ডাকিয়া আন। সে আমার সঙ্গে আহার করিবে।”

কর্ণ বালকের অন্বেষণে বাহিরে গেলেন। রাজপ্রাসাদের বাহিরে গিয়া কর্ণ দেখিলেন, বৃষকেতু নিজে, সঙ্গী বালকগণের সঙ্গে খেলা করিতেছে! কর্ণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নিজের চক্ষুকে নিজের বিশ্বাস হইল না।

বৃষকেতু—বৃষকেতু পিতাকে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার কোলে উঠিল। সে স্পর্শ কর্ণের প্রাণে প্রাণে গেল।

তখন গলদশ্রুবিধৌত কর্ণ বুঝিলেন,—কে—কে তুমি ব্রাহ্মণ!—

এই ব্রাহ্মণ আর কেউ ন'ন্— স্বয়ং বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণ!

ছলে নারায়ণ তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন; কর্ণ পরীক্ষায় জয়ী হইয়া 'দাতাকর্ণ' নামে জগতে চিরযশস্বী হইলেন,—রাণী পদ্মাবতীর অতুল মহত্ত্ব জগতে সহধর্ম্মিণীর আত্মত্যাগের চরম আদর্শ হইয়া রহিল।

বিশ্ববারা।

প্রাচীন আর্য্যমহিলারা কেবল যে ধর্ম্মশীলতা এবং উচ্চ চরিত্র মহিমায় জগতে আদর্শ স্থানীয়া ছিলেন, তাহা নয়; জ্ঞান গৌরবেও তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বিশেষ যশস্বিনী হইয়াছিলেন। ধর্ম্মতত্ত্ব, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনায় প্রাচীন ভারত বিশেষ বিখ্যাত ছিল। পুরুষের ন্যায় ভারতীয় নারী-গণও নানাবিধ বিদ্যা ও জ্ঞানালোচনা করিতেন। ইঁহাদের জীবনীর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। সংক্ষেপে কতিপয় বিদুষী নারীর বিবরণ আমরা নিম্নে দিতেছি। ইহাতে বর্ত্তমান বঙ্গীয় মহিলারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন, তাঁহাদেরই পূর্ব্ববতন আর্য্যরমণীরা কিরূপ উচ্চজ্ঞানে জ্ঞানবতী হইয়া ভারতের নাম গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন।

বেদ যে হিন্দুর প্রাচীনতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ, তাহা সকলেই জানেন। প্রাচীন ঋষিগণ, বিশ্বরূপ বিশ্বপ্রাণ বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্ব-দেবতার চিন্তায় আত্মহারা হইয়া— তাঁহাতে আপনাদের এক-প্রাণতা অনুভব করিয়া তাঁহারই মহিমাসূচক যে সব বাক্য উচ্চারণ করিতেন, যে সব স্তোত্র গান করিতেন, তাহাই বৈদিক মন্ত্র। তাই বৈদিক মন্ত্র স্বয়ং বিশ্বদেবতার বাণী বলিয়া হিন্দুরা বিশ্বাস করেন। তাই বৈদিক ঋষিগণকে হিন্দুরা 'মন্ত্রদ্রষ্টা' (অর্থাৎ যাঁহারা ভগবদ্ কৃপায় মন্ত্র দেখিয়াছেন বা পাইয়াছেন;

কেবল নিজের শক্তিতে রচনা করেন নাই) এই নাম দিয়াছেন। বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের মধ্যে স্ত্রীলোকও ছিলেন।

ধর্ম্ম ও জ্ঞান মহিমায় শ্রেষ্ঠমহিমাময়ী এই রমণীরা অনেক সময় মন্ত্ররচনা করিতেন এবং নিজেরাই যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন। এ বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা কোন অংশে তাঁহাদের ন্যূনতা দেখা যাইত না।

এই সব ঋষিরূপিণী রমণীদের মধ্যে বিশ্ববারা বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি অত্রিমুনির বংশে জন্মগ্রহণ করেন। চারিবেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রধান ঋগ্‌বেদের কোন কোন মন্ত্র ইঁহার রচিত। কোন কোন স্থলে ইনি যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছেন বলিয়াও উল্লেখ আছে। একস্থলে এইরূপ বর্ণনা আছে যে, স্নিগ্ধ মধুর উষায় প্রজ্বলিত অগ্নি আকাশে দীপ্তি বিস্তার করিতেছেন, এবং বিশ্ববারা হব্যপাত্র হস্তে লইয়া দেবগণের স্তব উচ্চারণ পূর্ব্বক পূর্ব্বদিকে অগ্নির নিকট গমন করিতেছেন।

সেই বর্ণনা একখানি দৈব-জ্যোতি মাখা চিত্রের মত সুন্দর। আর্য্যনারী বিশ্ববারা সেই যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে জ্ঞানজ্যোতি-বিমণ্ডিতা দেবতার মত মহিয়ষী।

গার্গী।

প্রাচীন ভারতে যত বিদুষী ও জ্ঞানবতী নারী আভির্ভূতা হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বোধহয় প্রতিভা ও জ্ঞানগরিমায় গার্গীই সর্ব্বপ্রধান ছিলেন।

ইহাঁর প্রকৃত নাম বাচক্নবী। গর্গমুনির বংশে জন্ম বলিয়া ইনি গার্গী নামে বিখ্যাত। বেদ প্রচারিত হইবার পরে ঋষিগণ যজ্ঞ ও অন্যান্য বৃহৎ অনুষ্ঠান প্রভৃতির উপলক্ষ্যে স্থানে স্থানে সমবেত হইয়া ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা করিতেন। এই সব আলোচনার বিবরণ যে সব গ্রন্থে পাওয়া যায়,—সেই সব গ্রন্থ উপনিষৎ নামে বিখ্যাত। মিথিলার রাজা জনকের সভায় এইরূপ অনেক আলোচনা হইত। গার্গী এই সব সভায় উপস্থিত ঋষি-গণের সঙ্গে ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা করিতেন। আলোচনায় গার্গী অনেক ঋষি অপেক্ষা আপনার শ্রেষ্ঠতর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন।

এক সময়ে জনক রাজা এক যজ্ঞ সম্পাদন করেন। নানা-দেশীয় ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও ঋষিগণ এই যজ্ঞে আগমন করেন। গার্গীও উপস্থিত হইলেন। সমবেত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রহ্মতত্ত্ব-জ্ঞানে কে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা নিরূপণ করিবার জন্য, জনক একসহস্র গাভী আনিয়া প্রত্যেকটির শৃঙ্গে দশটি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা

রাখিয়া কহিলেন,—"ব্রাহ্মণগণ! আপনাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি এই স্বর্ণমুদ্রাসহ গাভীগুলি লইয়া যাউন।"

ব্রাহ্মণগণ সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। আপনাকে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া পরিচয় দিয়া কেহই গাভী লইতে সাহসী হইলেন না।

তখন যাজ্ঞবল্ক্য আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন,—"এই গাভী-গুলি তোমরা আমার গৃহে লইয়া যাও।"

কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য যে, সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞ, ইহার কি প্রমাণ, এই বলিয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ আপত্তি করিলেন।

তখন গার্গী উঠিয়া কহিলেন,—"ব্রাহ্মণগণ! আপনারা নিরস্ত হউন। আমি যাজ্ঞবল্ক্যকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। যদি ইনি তাহার যথাযথ উত্তর দিতে পারেন, তাহা হইলে বুঝিব ইঁহার তুল্য ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানী আর কেহই নাই।"

গার্গীর কথায় ব্রাহ্মণগণ নীরব হইলেন। তখন গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে জগৎতত্ত্ব এবং ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি অতি দুরূহ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য সকল প্রশ্নের অতি বিশদ উত্তর করিয়া গার্গীকে সন্তুষ্ট করিলেন। গার্গী তখন অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনায় ইঁহাকে কেহই আপনারা পরাস্ত করিতে পারিবেন না। যদি নমস্কার করিয়াই ইঁহার নিকট আপনারা মুক্তিলাভ করিতে পারেন, তাহাই

আপনারা বহুলাভ মনে করিবেন। এই সভায় একমাত্র যাজ্ঞবল্ক্যই জনক প্রদত্ত এই সমস্ত গাভী গ্রহণের যোগ্য।"

গার্গীর সিদ্ধান্ত সকলে অবনত মস্তকে গ্রহণ করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য গাভী লইয়া গৃহে গেলেন।

জ্ঞান গৌরবে জগৎ-শ্রেষ্ঠ ভারতের প্রাচীন ব্রাহ্মণ-সভায় এইরূপে একজন রমণী আপনার উচ্চ জ্ঞান-শক্তিবলে পণ্ডিত-মণ্ডলীর তর্ক মীমাংসা করিয়া দেন। গার্গী যে কিরূপ প্রতিভা-শালিনী ছিলেন, এবং প্রতিভাবলে তিনি সমসাময়িক পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কতদূর সম্মানিতা ছিলেন, এই একটি মাত্র ঘটনাতেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

মৈত্রেয়ী

পূর্ব্ব আখ্যায়িকায় যে জ্ঞানীপ্রবর যাজ্ঞবল্ক্যের কথা বর্ণিত হইয়াছে, মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে তাঁহার দুই স্ত্রী ছিলেন। বিদ্যা ও জ্ঞানে ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী স্বামীর যোগ্য সহধর্ম্মিণী ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক হইবার মানসে একদিন মৈত্রেয়ীকে কহিলেন,—"মৈত্রেয়ী, আমি গৃহত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক হইব। আমার বিষয়-সম্পত্তি যাহা আছে, তাহা লইয়া তোমার ও কাত্যায়নীর মধ্যে বিবাদ উপস্থিত না হয়, তাই আমি তোমাদের দু'জনের মধ্যে সব ভাগ করিয়া দিতে চাই।"

মৈত্রেয়ী কহিলেন,—"প্রভু, বিষয় সম্পত্তি লইয়া আমি কি করিব? ইহা তো অতি সামান্য বিত্ত, যদি পৃথিবীর রাজত্বও আমি পাই, তাহাতেই বা লাভ কি! ইহাতে কি আমি অমরত্ব লাভ করিব?"

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—"না, অমরত্ব ইহাতে পাইবে না। তবে ধনীদের ন্যায় বিষয় ভোগের লালসা পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে মাত্র।"

মৈত্রেয়ী কহিলেন,—"প্রভু, অসার ও অনিত্য বিষয়ভোগে আমার কোন স্পৃহা নাই। আপনার সম্পত্তির অংশ আমি চাই না। যে নিত্যধন ব্রহ্মজ্ঞান লাভে মানব অমরত্ব লাভ করিতে

পারে, আমি তাহারই প্রার্থিনী। আপনার সঙ্গ আর লাভ করিব না। আপনার নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা আমার আর হইবে না। যদি পরিব্রাজকের জীবন অবলম্বনে আপনার অভিলাষ হইয়া থাকে, আমি তাহাতে বাদিনী হইব না। আপনার বিষয় সম্পত্তি সব কাত্যায়নীকে দান করুন। অমরত্ব লাভের উপায় স্বরূপ যে নিত্যধন ব্রহ্মজ্ঞানের আপনি অধিকারী, তা'ই আমাকে দিন্। আমার মানব জীবন ধন্য হউক।"

যাজ্ঞবল্ক্য যা'র-পর-নাই সন্তুষ্ট হইয়া নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মতত্ত্ব সমন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। স্বামী পরিব্রজ্যায় গমন করিলে, মৈত্রেয়ী স্বামীপ্রদত্ত তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় ও নিয়ত সাধনায় প্রশান্ত চিত্তে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। যে অমরত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষায়, পার্থিব সকল সুখ-ভোগ তিনি ধূলির মত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন সাধনায় সেই অমরত্ব লাভে তাঁহার মানব জীবন ধন্য হইল।

পৃথিবীতে যাহাকে আমরা সুখ বলি,—সুখী হইব বলিয়া যাহা পাইবার জন্য আমরা আজীবন কত খাটি, কত ঘুরি, তাহাতে বাস্তবিক স্থায়ী সুখ, স্থায়ী তৃপ্তি আমরা পাই না। ভোগ, ঐশ্বর্য্য, পদ গৌরব যশোমান—পৃথিবীতে যাহা কিছু কাম্য বলিয়া মনে হয়, সে সবই যে পাইয়াছে, সেও প্রাণের শেষ শান্তি শেষ তৃপ্তি পায় না। তাই ভোগী আরো ভোগ চায়, ধনী আরো ধন চায়,পদস্থ আরো উচ্চপদ চায়, যশস্বী আরো যশঃ চায়, মানী আরো মান চায় ;—যা' আছে তা'তে সুখ না পাইয়া, ইহারা

মনে করে, আরো পাইলে বুঝি সুখী হইব! কিন্তু, যত চায়, যত পায়, তত আরো চায়;—সকল কামনার শেষ পূর্ণতায় উঠিয়াও মানব দেখিতে পায়, তা'র প্রাণের ক্ষুধা মিটিল না; অজানা যে শূন্যতা ছিল, তাহা পূর্ণ হইল না; সে সুখী হইল না; তৃপ্ত হইল না!

এ ক্ষুধা, এ শূন্যতা, আত্মার। পার্থিব ভোগসুখে এ ক্ষুধা মিটে না। পার্থিব কোন কাম্য বস্তু লাভে এ শূন্যতা পূর্ণ হয় না। নিত্য, সচ্চিদানন্দ বিশ্ব-আত্মা স্বরূপ ব্রহ্মকে চিনিয়া, ব্রহ্মসত্ত্বায় আপনার নিত্য সম্বন্ধ অনুভব করিয়া, ব্রহ্মে সম্পূর্ণ আত্মমিলন, ও আত্ম সমর্পণে, নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দ সুধা পান—আত্মার এই ক্ষুধা মিটাইবার, এই শূন্যতা পূর্ণ করিবার একমাত্র উপায়। মানব বোঝে না; আপনার অন্তরের দিকে চায় না; তাই অন্তর চিনে না। তাই অন্তরেব প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা কি, কিসে সে আকাঙ্ক্ষা মিটিবে, কিসে সে আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া প্রাণের শেষ চিরতৃপ্তি লাভ হইবে, এসব সম্বন্ধে সে একেবারে অন্ধ থাকে। এই অন্ধত্বই মোহ। এই মোহের বশেই মানব সুখের জন্য পার্থিব ভোগ ঐশ্বর্য্য যশোমানের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়ায়; কিন্তু সুখ পায় না।

প্রকৃত অন্তর-দৃষ্টি যাঁহার আছে, তিনি অন্তর চিনিয়া—অন্তরের এই আকাঙ্ক্ষা চিনিয়া—ধূলির মত অসার অনিত্য বিষয় ভোগ ত্যাগ করিয়া, তত্ত্বজ্ঞানে, পরমাত্মীয় আত্মার মিলনে জীবনের চিরশান্তি চিরতৃপ্তি লাভ করিতে চান। জীবনের এই চরমশান্তি চরমতৃপ্তি, —যাহার বিনাশ নাই, শেষ নাই, পরিবর্ত্তন নাই, যাহাতে সমান

আনন্দে চিরদিন মোহমুক্ত অচঞ্চল মানবাত্মা বিভোর হইয়া থাকে, তাহাই অমরত্ব।

সাধনার বলে মৈত্রেয়ীর প্রকৃত অন্তর-দৃষ্টি জন্মিয়াছিল, অন্তর চিনিয়া এই অমরত্ব লাভের জন্য তিনি পার্থিব অসার—অনিত্য ধন-সম্পদ সব ত্যাগ করিয়া একমাত্রসার নিত্যধন ব্রহ্ম যিনি, তাঁহার তত্ত্ব-দর্শনে, তাঁহাকে পাইবার জন্য, এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন; তাঁহার প্রাণের সকল কামনা সেইদিকে ছুটিয়াছিল; তাঁহার প্রাণ ভরিয়া আকুল প্রার্থনা উঠিয়াছিল—

"অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতঙ্গময়,
আবিরাবীর্ম এধি,
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং,
তেন মাং পাহি নিত্যম্।"

[অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও।
অন্ধকার হইতে আমাকে আলোকে লইয়া যাও।
মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও।
হে প্রকাশ স্বরূপ, তুমি আমাতে প্রকাশিত হও।

হে রুদ্র, তোমার প্রসন্নমুখ আমাকে দেখাও; সেই প্রসন্ন মুখে আমাকে রক্ষা কর।]

এই প্রার্থনার মত এমন শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা—সুন্দর প্রার্থনা আর হইতে পারে না।

জীবনের চরমশান্তি, চরমতৃপ্তি লাভের জন্য মানবের প্রাণে যাহাকিছু আকাঙ্ক্ষা উঠিতে পারে, তাহা সকলই এই কয়েকটি কথায় পূর্ণভাবে মৈত্রেয়ীর প্রার্থনায় ব্যক্ত হইয়াছে।

দেবহূতি ও অরুন্ধতী।

(১)

প্রাচীন কালে এদেশে জগৎপ্রকৃতি, মানব প্রকৃতি, মানবের মন ও আত্মার তত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে গভীর যুক্তিপূর্ণ কতকগুলি প্রসিদ্ধ পুস্তক লিখিত হয়। এই পুস্তকগুলিকে দর্শন শাস্ত্র বলে। এই দর্শন শাস্ত্রগুলির মধ্যে সাঙ্খ্য দর্শন সর্ব্বপ্রথমে রচিত হয়। গভীর যুক্তিসম্বলিত, মানব-আত্মা ও মানব-প্রকৃতির তত্ত্ব আলোচনা সম্বন্ধে এই সাঙ্খ্যদর্শনের মত গ্রন্থ জগতে দুর্লভ। মহর্ষি কপিল এই সাঙ্খ্য দর্শন লিখিয়াছেন। দেবহূতি এই মহর্ষি কপিলের মাতা।

দেবহূতি, সায়ম্ভব মনু নামক কোন প্রসিদ্ধ ঋষির কন্যা। পিতার নিকট ইনি নানা বিদ্যায় বিশেষ শিক্ষিতা হন। এই সময় কর্দ্দম নামে সুপণ্ডিত ও পরম ধার্ম্মিক এক ঋষি ছিলেন। কর্দ্দমের বিদ্যা, জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মশীলতা দেখিয়া দেবহূতি তাঁহাকে স্বামী মনোনীত করিয়া পিতাকে জানাইলেন।

যোগ্য কন্যার যোগ্য অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া পিতা অতি আনন্দিত মনে কর্দ্দমকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন

দেবহূতির ক্রমে নয়টি কন্যা এবং কপিল নামক পুত্র জন্মিল। কপিল বয়োপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহার উপর স্ত্রী ও কন্যাগণের প্রতি পালনের ভার দিয়া কর্দ্দম বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন।

এই সময় কপিল সাঙ্খ্য দর্শন শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া সর্ব্বত্র বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। পণ্ডিতা জ্ঞানবতী মাতা, সুপণ্ডিত জ্ঞানবান্ পুত্রের সঙ্গে নানাবিধ শাস্ত্রানুলোচনায় পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

কপিলের সাঙ্খ্য প্রণয়নের পর, দেবহূতিরও সাঙ্খ্যে লিখিত তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিশেষ আগ্রহ হইল। একদিন তিনি পুত্রকে কহিলেন,—"পুত্র, অনেক শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু প্রাণের মোহ কিছুতেই দূর হইল না। কিছুতেই 'আমি' ও 'আমার' এই ভাব দূর করিয়া, জীবের সার, —বিশুদ্ধ আত্মপুরুষকে চিনিতে পারিলাম না। তোমার সাঙ্খ্যশাস্ত্রে বর্ণিত পুরুষ ও প্রকৃতির তত্ত্ব আমাকে বুঝাইয়া, যাহাতে আমি মোহমুক্ত হইয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে পারি, তা'ই কর।"

কপিল মাতাকে তখন সমগ্র সাঙ্খ্য শাস্ত্র বিশদরূপে বুঝাইলেন। দেবহূতি তত্ত্বজ্ঞান লাভে এবং সেই জ্ঞানের চিন্তা ও ধ্যানে ক্রমে আপনার আমিত্ব ভুলিয়া এবং মোহমুক্ত আত্মা-পুরুষকে চিনিয়া মোক্ষ লাভ করিলেন।

যে স্থানে তিনি এইরূপ সিদ্ধি লাভ করেন, সেইস্থান সিদ্ধি-পদ নামে বিখ্যাত হইল। বহুকাল পর্য্যন্ত লোকে এই স্থানকে পুণ্য তীর্থ বলিয়া মনে করিত।

(২)

দেবহূতির যে নয় কন্যা জন্মে, তাঁহারা সকলেই বিশেষ বিদ্যাবতী ও ধর্ম্মশীলা ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অরুন্ধতীর নামই বিশেষ প্রসিদ্ধ। অরুন্ধতী অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় রাজাদের কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ দেবের পত্নী ছিলেন। তাঁহার জীবনের উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন ঘটনা পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক স্থলে— অরুন্ধতী বিশেষ বিদ্যাবতী, জ্ঞানবতী ও প্রতিভাশালিনী রমণী ছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। কায়ার সহিত ছায়ার ন্যায় তিনি নিরন্তর স্বামীর সাহচর্য্যে বাস করিতেন।

খনা।

(১)

জ্যোতিষ ও গণিত শাস্ত্র এই দুই বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারতের আর্য্যগণ বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। অনেকে বলেন, এই দুই বিজ্ঞান এদেশেই প্রথম আবিষ্কৃত হয় এবং বিশেষ উন্নতি লাভ করে। পুরুষের ন্যায় প্রাচীন আর্য্যনারীরাও নানাবিধ বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে খনা এখং গণিতশাস্ত্রে লীলাবতীর নাম বিশেষ বিখ্যাত। জ্যোতিষ ও গণিতের আলোচনায় অনেক পুরুষও ইঁহাদের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই।

মহারাজা বিক্রমাদিত্যের নাম এদেশে সকলেরই পরিচিত। মধ্যভারতের পশ্চিমভাগে মালব নামে একটি প্রদেশ আছে। প্রায় ২০০০ বৎসর আগে বিক্রমাদিত্য—সেই মালবের রাজা ছিলেন। প্রসিদ্ধ উজ্জয়িনী নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। বিক্রমাদিত্যের সভায় অনেক বড় বড় কবি ও পণ্ডিত, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান নয়জনকে লোকে নবরত্ন বলিত। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভা এখনো ভারতে বিখ্যাত। ভারতের সর্ব্বপ্রধান

কবি, ভারতবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতার চির পরিচিত—কালিদাস এই নবরত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন। বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ বরাহও ইঁহাদের মধ্যে এক রত্ন ছিলেন।

বরাহের মিহির নামে এক পুত্র হয়। পুত্র জন্মিবার পরেই বরাহ গণনা করিয়া দেখিলেন, পুত্রের পরমায়ু মাত্র ১০ বৎসর। মিছা এই অল্পায়ু পুত্রকে প্রতিপালন করিয়া মায়া বাড়াইয়া দারুণ শোক সহ্য করায় ফল কি, তাই বরাহ শিশু পুত্রকে একটি মাটির হাঁড়িতে রাখিয়া জলে ভাসাইয়া দিলেন। কোন দীন ব্যক্তি পুত্রটিকে পাইয়া প্রতিপালন করিল, মিহির মরিল না। বরাহ গণনায় ভুল করিয়াছিলেন। মিহিরের পরমায়ু ১০০ বৎসর। একটা শূন্যের ভুল করিয়া বরাহ পুত্রকে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন।

মিহির বয়োপ্রাপ্ত হইয়া দেশ ভ্রমণে বাহির হন। নানাস্থান ঘুরিয়া শেষে লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। এই সময় লঙ্কাদ্বীপে জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা হইত। মিহির এখানে জ্যোতিষ শিখিলেন। লঙ্কায় কোন বিখ্যাত জ্যোতিষীর ঘরে খনা নামে এক রমণী জ্যোতির্ব্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী হইয়াছিলেন। খনা কা'র কন্যা, কোথায় তাঁহার আদি নিবাস কিছু জানা যায় না। তাঁ'র প্রথম জীবন সম্বন্ধে এই মাত্র পরিচয় পাওয়া যায় যে, লঙ্কার সেই প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যায় তাঁহাকে বিশেষ শিক্ষিতা করেন।

মিহির খনাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

(২)

ক্রমে বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে মিহিরের পরিচয় হইল। মিহিরের জ্ঞানে বিশেষ প্রীত হইয়া বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে নিজ রাজধানীতে লইয়া আসিলেন। মিহির নবরত্ন সভার একজন সদস্য হইলেন। মিহিরের বাল্য জীবনের পরিচয় পাইয়া এবং অনুসন্ধানে অন্যান্য বিষয় জানিয়া বরাহ বুঝিতে পারিলেন, মিহিরই তাঁহার পুত্র। পুত্র ও পুত্রবধূকে বরাহ আদরে নিজ গৃহে গ্রহণ করিলেন।

জ্যোতির্ব্বিদ্যায় খনা, শ্বশুর ও স্বামী অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বরাহের বিদ্যার যথেষ্ট গভীরতা ছিল বটে, কিন্তু গণনায় তিনি মধ্যে মধ্যে ভুল করিতেন। শিশুপুত্র মিহিরের বিসর্জ্জনেই পাঠিকারা তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। অনেক লোক বরাহের নিকট গণাইতে আসিত। কথিত আছে, বরাহ কোন ভুল করিলে, খনা ঘরের মধ্য হইতে তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন, বরাহ বড় লজ্জা পাইতেন। পুত্রবধূর শ্রেষ্ঠতর জ্ঞানে কিছু ঈর্ষ্যাও তাঁহার জন্মিল। কাজেই বরাহ, খনার উপর মনে মনে বড় সন্তুষ্ট ছিলেন না। পাঠিকারা হয়তো মনে করিতে পারেন, খনারও বড় বাড়াবাড়ি। শ্বশুর কোন ভুল করিলে লোকের সম্মুখে বধূর কি সেই ভুল শোধ্‌রাইয়া শ্বশুরকে লজ্জা দেওয়া উচিত? কিন্তু এখানে আমাদের এইটুক বিবেচনা করা উচিত যে, এ সব সাধারণ ঘর-গৃহস্থালীর কথা নয়। ভাগ্য

গণনায় ভুল হইলে লোকের অনেক অনিষ্ট হইতে পারে। একটা শূন্য ভুল করিয়া বরাহ নিজের পুত্রকে পর্য্যন্ত মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। শ্বশুরের ভুলে লোকের এমন সর্ব্বনাশ কিছু না ঘটে, তাই খনা তাঁ'র ভুল ধরিয়া ঠিক করিয়া দিতেন।

খনা যে কেবল শ্বশুরের ভুল ধরিয়া দিতেন, তা'নয়; বরাহ জানিতেন না এমন অনেক কঠিন গণনাও তিনি জানিতেন। এই সব গণনায় শ্বশুর কখনো ঠেকিলে, খনা তাঁহাকে নিয়ম শিখাইয়া দিতেন।

একদিন বিক্রমাদিত্য বরাহকে আকাশের তারা সম্বন্ধে একটি অতি কঠিন জ্যোতিষী গণনার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। বরাহ তখন গণনা করিতে না পারিয়া বলিলেন,—"কাল প্রাতে গণনা করিয়া বলিব।" সন্ধ্যার পর বরাহ গৃহে ফিরিয়া আবার সেই প্রশ্নের গণনা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই মিমাংসা করিতে না পারিয়া বিমর্ষ ভাবে বসিয়া রহিলেন।

খনা এত বিদ্যাবতী হইলেও নিজের হাতে রাঁধিয়া শ্বশুর, স্বামী ও অন্যান্য পরিবারবর্গকে খাওয়াইতেন। রন্ধন শেষ করিয়া খনা শ্বশুরকে আহারের জন্য ডাকিতে আসিয়া দেখিলেন, শ্বশুর বড় বিমর্ষ হইয়া বসিয়া আছেন। কারণ শুনিয়া খনা কহিলেন,—"আপনি চিন্তা করিবেন না, আহার করুন, আমি এখনি গণিয়া দিতেছি।"

বরাহ আহারে বসিলেন। খনা কাছে বসিয়া অতি অল্প সময়ে সেই কঠিন প্রশ্নের গণনা করিয়া দিলেন। সময়ে সময়ে

কিছু অপমানিত বোধ করিলেও, পুত্রবধূর বিদ্যায় এবার রাজ-সভায় বরাহের মান বাঁচিল। বরাহ যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইলেন। এমন বধূরত্ন লাভে আপনাকে ধন্য মনে করিলেন।

পরদিন রাজসভায় গিয়া বরাহ গণনার ফল বিক্রমাদিত্যকে জানাইলেন। কিরূপে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, বিক্রমাদিত্য জানিতে চাহিলেন। বরাহ কিছু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন,—"মহারাজ, মার্জ্জনা করিবেন। আমি নিজে এ গণনা করি নাই, করিতে পারিতাম না।"

রাজা কহিলেন,—"তবে কে গণনা করিয়াছে? মিহির?"

বরাহ কহিলেন,—"না মহারাজ, মিহিরও নয়; মিহিরের স্ত্রী—আমার পুত্রবধূ। মিহিরও ইহা গণিতে পারিত না।"

সকলে যার-পর-নাই বিস্মিত হইলেন, খনা জ্যোতির্ব্বিদ্যা কিছু কিছু আলোচনা করিতেন এই মাত্র সকলে জানিতেন। বরাহের পুত্রবধূ, মিহিরের স্ত্রীর পক্ষে ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু খনা যে জ্যোতিষ শাস্ত্রে এত গভীর জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, ইহা কেহ স্বপ্নেও কখনও ভাবেন নাই। এমন বিদূষী নারী তাঁহার রাজধানীতে আছেন, বিক্রমাদিত্য আপনাকে ধন্য মনে করিলেন। তিনি বরাহকে আদেশ করিলেন, পরদিন রাজসভায় খনাকে লইয়া আসিবেন। সভায় খনার সঙ্গে তিনি জ্যোতিষের আলোচনা করিয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবেন।

বরাহ বড় ক্ষুণ্ণ হইলেন। রাজসভায় কুলবধূ উপস্থিত হইয়া বিদ্যা আলোচনা করিবে, তাঁহার ও তাঁহার পুত্রের উপর বধূর

জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপিত হইবে, ইহা বরাহের সহ্য হইল না। তিনি মিহিরকে আদেশ করিলেন,—"খনার জিহ্বা কাটিয়া ফেল।"

মিহির স্তম্ভিত হইলেন। খনা তাঁহার স্ত্রী; বিদ্যায়, জ্ঞানে, গুণে, সর্ব্বথা তাঁহার জীবনের সঙ্গিনী; খনার মত স্ত্রীরত্ন লাভে জীবন তাঁ'র ধন্য ও গৌরবান্বিত;—আজ সেই খনাকে নিজের হস্তে তিনি নিষ্ঠুর যাতনাময় এমন লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত করিবেন! খনার জীবনান্ত পর্য্যন্ত ইহাতে ঘটিতে পারে। বিনা অপরাধে এমন নিষ্ঠুর ভাবে এমন স্ত্রীকে মৃত্যুমুখে তিনি বিসর্জ্জন দিবেন! কিন্তু এ দিকে পিতার আদেশও অলঙ্ঘনীয়। কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া নীরবে মিহির স্থানান্তরে গমন করিলেন।

খনা শ্বশুরের আদেশ জানিতে পারিয়া স্বামীকে কহিলেন,—"কেন তুমি পিতার আদেশ পালনে দ্বিধা করিতেছ, এত ক্ষুব্ধ হইতেছ? আমি কোন্ ছার যে, আমি যাতনা পাইব, অকর্ম্মণ্য হইব, কি আমার মৃত্যু হইবে, এই জন্য তুমি পিতার আদেশ লঙ্ঘনে মহাপাপ সঞ্চয় করিবে! আঘাত, মৃত্যু, আকস্মিক ঘটনায় অকর্ম্মণ্যতা, ইহা মানব জীবনের নিত্য অবশ্যম্ভাবী নিয়তি। কর্ম্মফলে যাহার যখন এই সব ভোগ করিতে হইবে, কেহই তখন তাহা প্রতিরোধ করিতে পারে না। প্রতিরোধের চেষ্টাও মূর্খতা। বিধাতার বিধানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কে সফলতার আশা করিতে পারে? তুমি ভাবিও না, মায়ামুগ্ধ হইয়া ধর্ম্মপালনে বিমুখ হইও না। আমি নিজেও

"গণিয়া দেখিয়াছি, এই দুর্ঘটনা ও দুর্ঘটনা হইতে মৃত্যু আমার কর্ম্মফলজাত নিয়তি।"

মিহির খনার জিহ্বা কাটিয়া ফেলিলেন, খনার মৃত্যু হইল।

কেহ কেহ বলেন, খনা বরাহের গণনার ভুল ধরিয়া দিতেন বলিয়া ক্রোধে ও ঈর্ষ্যায় বরাহ, মিহিরকে এইরূপ নিষ্ঠুর আদেশ করেন। যে কারণেই হউক, বরাহের আদেশে মিহির খনার জিহ্বা কাটিয়া ফেলেন এবং তাহাতেই খনার মৃত্যু হয়, খনার জীবনীতে এইরূপ বর্ণিত আছে।

এইরূপে অকালে মৃত্যু হইলেও খনার নাম এদেশে সর্ব্বত্র পরিচিত। খনার বিদ্যা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রভৃতিতে সাধারণ লোকের এরূপ গভীর বিশ্বাস যে, এদেশের অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী কৃষকগণ কৃষি প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক প্রবাদবাক্য রচনা করিয়া খনার নামে তাহা প্রচলিত করিয়াছে। এই সব প্রবাদবাক্যকে সকলে খনার বচন বলে। সাধারণ লোকের মুখে সর্ব্বদা এইরূপ অনেক খনার বচন শুনিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার প্রচলিত সহজ বাঙ্গালায় রচিত অনেক জ্যোতিষী-সূত্রও খনার বচন নামে পরিচিত।

লীলাবতী।

(১)

আট নয় শত বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতবর্ষে ভাস্করাচার্য্য নামে গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রে অতি প্রসিদ্ধ এক পণ্ডিত ছিলেন। লীলাবতী ইঁহার একমাত্র কন্যা।

লীলাবতীর ভাগ্যগণনা করিয়া ভাস্করাচার্য্য দেখিলেন যে, বিবাহের অল্প পরেই ইনি বিধবা হইবেন।

তখন ভাস্করাচার্য্য স্থির করিলেন, এমন শুভলগ্ন ধার্য্য করিয়া কন্যার বিবাহ দিবেন, যাহাতে বৈধব্য দোষ না ঘটিতে পারে।

অনেক আলোচনা ও গণনা করিয়া, ভাস্করাচার্য্য এইরূপ এক শুভলগ্ন পাইলেন।

ঠিক সময় নির্দ্দেশের জন্য এই নিয়ম স্থির হইল যে, একটি ছোট পাত্র ছিদ্র করিয়া জলের উপর বসাইয়া রাখা হইবে; পাত্রের ছিদ্র দিয়া জল উঠিয়া পাত্র যখন ডুবিয়া যাইবে, তখনই বিবাহ দিতে হইবে।

এইরূপে নির্দ্দিষ্ট শুভ মুহূর্ত্তে বিবাহ দিতে পারিলে কন্যা বিধবা হইবে না।

ভাস্করাচার্য্য বিবাহের আয়োজন করিলেন। দিন স্থির হইল; সময় নির্দ্দেশের জন্য সছিদ্র পাত্র জলের উপর বসাইয়া সকলে

সোৎসুক নেত্রে পাত্র কখন্ ডুবিয়া যায় তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কৌতুহল বশতঃ লীলাবতী পাত্রের কাছে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার পরিধানে তখন বিবাহের বেশ, মাথায় বিবাহের মুকুট। লীলাবতী পাত্রের দিকে মাথা নিচু করিয়া পাত্র কখন ডোবে তাহা দেখিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার মুকুট হইতে একটি ক্ষুদ্র মুক্তা খসিয়া পাত্রের মধ্যে পড়িল এবং ছিদ্র তাহাতে বন্ধ হইয়া গেল।

মুক্তাটি এত ছোট ছিল যে কেহই এ ঘটনা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না।

সামান্য একটি জল-বিম্বের ন্যায় মুক্তাটি পাত্রস্থ জলের উপর একটু ভাসিয়া, ডুবিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে লীলাবতীর সাংসারিক সুখভাগ্যও ডুবিল।

অনেকক্ষণ চলিয়া গেল, পাত্র আর ডোবে না, জলও বাড়ে না। সকলে কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, লীলাবতীর মুকুটের এক ক্ষুদ্র মুক্তা পাত্রের ছিদ্র বন্ধ করিয়া আছে। ঠিক কতক্ষণ মুক্তা এই ভাবে আছে, কতক্ষণ ছিদ্র দিয়া আর জল উঠিতেছে না, তাহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না। সুতরাং বিবাহের ঠিক শুভ মুহূর্ত্ত নির্দ্দেশ তখন অসম্ভব হইল। সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া ভাস্করাচার্য্য যার-পর-নাই ক্ষুণ্ণ হইলেন।

ভবিতব্যতা কেহ খণ্ডন করিতে পারে না, বিধাতার বিধান কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না, কর্ম্মফলে যাহার যে দুঃখ ভোগ

নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে তাহা ভুগিতেই হইবে, তাই ভাস্করাচার্য্য আর দ্বিধা না করিয়া লীলাবতীর বিবাহ দিলেন।

বিবাহের অল্প পরেই লীলাবতী বিধবা হইলেন।

(২)

পতিপুত্রহীনা অভাগী লীলার শূন্য সংসারে শূন্য জীবন কিরূপে কাটিবে, ভাবিয়া ভাস্করাচার্য্য আকুল হইলেন। শেষে তাঁহার মনে হইল, 'ভাল, লীলাকে কেন গণিত ও জ্যোতিষ প্রভৃতি বিদ্যা শিখাই না? একান্ত মনে বিদ্যালোচনায় লীলার জীবনের শূন্যতা পূর্ণ হইতে পারে।'

একমাত্র পতিসেবা ও সন্তানপালনে ক্ষুদ্র সংসার-সীমায় আবদ্ধ না থাকিয়া লীলার জীবনক্ষেত্র বহু বিস্তৃত হইবে; সাংসারিক সুখভোগে বঞ্চিতা হইয়াও অমর কীর্ত্তিলাভে লীলার এই পার্থিব জীবন ধন্য হইবে, লীলার বৈধব্য তাঁহার জীবনের মহত্ত্বের কারণ হইবে, এখন এই চিন্তা করিয়াই ভাস্করাচার্য্য অতি যত্নে লীলাবতীকে গণিত ও জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রে শিক্ষা-দান আরম্ভ করিলেন। বিদ্যালোচনায় লীলাবতী সমস্ত মন সমর্পণ করিলেন। অচিরে পাটীগণিত ও বীজগণিত শাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শিনী হইয়া উঠিলেন।

পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে ভাস্করাচার্য্য 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' নামে এক বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের গণিত ভাগের অনেক অংশ লীলাবতীর রচিত।

পাটীগণিত অংশের নামই 'লীলাবতী।' পিতা প্রশ্ন করিতেছেন এবং লীলাবতী তাহার উত্তর করিতেছেন, এই ভাবে এই পুস্তকখানি লিখিত। হিন্দুগণিতের 'লীলাবতীর নিয়ম' নামে নিয়মগুলি ইয়োরোপ প্রভৃতি অঞ্চলেও প্রসিদ্ধ। সেখানকার গণিতজ্ঞ পণ্ডিতেরাও প্রাচীন হিন্দুবিধবার এই পাটীগণিত ও বীজগণিতের নিয়মগুলির বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। শোনা যায়, ৮।৯ আট নয় শত বৎসর পূর্ব্বে এই দেশে, লীলাবতী গণিত সম্বন্ধীয় যে সব জটিল সমস্যার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ অতি অল্পকাল মাত্র হইল সেই সব সমস্যার সিদ্ধান্ত করিতে পারিয়াছেন।

যে কামনা করিয়া ভাস্করার্য্য বালবিধবা কন্যাকে বিদ্যালোচনায় নিয়োগ করিয়াছিলেন, সে কামনা তাঁহার পূর্ণ হইয়াছে। পতি পুত্র লইয়া কত রমণীই তো সুখে সচ্ছন্দে সংসারে জীবন কাটাইয়া যান, কিন্তু কয় জনে লীলাবতীর মত জগতের জ্ঞানোন্নতির সহায়তা করিয়া এরূপ চির কীর্ত্তিমতী হইতে পারেন? যোগ্য পিতা বিধবা বালাকে যোগ্য ব্রতেই নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাই বৈধব্যও লীলাবতীর জীবনের মহত্বের কারণ হইয়াছিল।

হায় আর্য্যসন্তান! তোমাদের অনেকের ঘরেই এমন অনেক বাল-বিধবা কন্যা রহিয়াছে, তোমাদের যত্নের অভাবে শূন্য সংসারে *শূন্য নিষ্ফল ও দারুণ নিরাশাপূর্ণ* দুঃখময় জীবন তা'রা বহন করিতেছে। একবার তোমাদেরই দেশবাসী ভাস্করাচার্য্যের

দিকে চাও। তাঁ'রই মত বিধবা কন্যার শূন্য জীবনে পূর্ণতা আনিয়া দাও, সংসারে তাঁ'র নিষ্ফল জীবন জগতের হিতে সফল করিয়া দাও!

স্বামীর স্মৃতির মহা অর্চ্চনার সহিত পবিত্র বিদ্যার আলোচনায় এইরূপে ব্রহ্মচর্য্য সার্থক করিয়া আবার তোমাদের ঘরে তাঁ'রা লীলাবতীর মত হইয়া এই হতভাগ্য দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন।

গোপা।

(১)

আমাদের দেশের পাঠিকারা বোধ হয় অনেকে বৌদ্ধধর্ম্মের কথা ভাল জানেন না।

আড়াই হাজার বৎসরের বেসি হইল, বুদ্ধদেব নামক এক মহাপুরুষ ভারতবর্ষে এই ধর্ম্ম প্রচার করেন। বুদ্ধদেবের পরে কয়েক শত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধধর্ম্মই ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। বুদ্ধদেব বলিতেন যে, কেবল বৈদিক যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ধর্ম্ম সাধন হয় না; পবিত্র জীবন, সাধু চিন্তা প্রভৃতিই প্রকৃত ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সকলেই সমান ভাবে এই উচ্চ ধর্ম্মের অধিকারী। যজ্ঞে পশু বলি অথবা অন্য যে কোন কার্য্যে জীব হত্যা মহাপাপ। সকলে ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভেদ ভুলিয়া সর্ব্ব প্রকার জীবহিংসা পরিত্যাগ করিয়া, ভোগবিলাসহীন পবিত্র সাধুজীবন জাপন করিবে এবং জগতের হিত সাধন করিবে, এইরূপে, ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে মানুষের আত্মা সকল প্রকার মোহ ও পাপ-বাসনার অতীত হইয়া, মুক্তি লাভ করিবে। ইহাই বৌদ্ধ ধর্ম্মের সার কথা।

যাঁহারা বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেন, তাঁহারা কেহ কেহ একেবারে গৃহধর্ম্ম ত্যাগ কয়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া মঠে থাকিতেন—আপনার মুক্তির জন্য ধর্ম্ম চিন্তা ও ধর্ম্ম সাধনা, লোকসেবা এবং ধর্ম্ম প্রচার, ইহাই এই সন্ন্যাসীদের প্রধান কার্য্য ছিল।

ইঁহারা ভিক্ষা দ্বারা আহার সংস্থান করিতেন, তাই এই সন্ন্যাসী-দিগকে 'ভিক্ষু' বলিত। আবার অনেকে গৃহধর্ম্মে থাকিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিয়মানুসারে চলিতেন,—ইঁহাদিগকে 'গৃহী' বৌদ্ধ বলিত। বুদ্ধদেব নিজে যখন ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, তখন গৃহী অপেক্ষা ভিক্ষু বৌদ্ধই বেসি ছিলেন।

বিহার প্রদেশের উত্তর পশ্চিমে হিমালয়ের নিকটে, প্রাচীন-কালে কপিলবস্তু নামে এক নগর ছিল। শাক্য বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা শুদ্ধোধন এই নগরের রাজা ছিলেন। ইঁহারই পুত্র সিদ্ধার্থ, তপস্যায় সিদ্ধি ও উচ্চ ধর্ম্মবুদ্ধি লাভ করিয়া বুদ্ধদেব নামে প্রসিদ্ধ হন।

সিদ্ধার্থের জন্মের পরেই কোন সিদ্ধ পুরুষ শিশু রাজপুত্রকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, এই বালক, কালে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া একজন প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ হইবে। শুদ্ধোধন বহুদিন অপুত্রক ছিলেন; বৃদ্ধকালে রাজবংশের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ এই পুত্র জন্মিয়াছে, সে রাজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবে, শুদ্ধোধন এই চিন্তায় বড়ই ক্ষুণ্ণ হইলেন। পুত্রের সন্ন্যাসের দিকে মতি না যায়, এইজন্য সিদ্ধার্থ বড় হইলে, রাজা তাঁহাকে নানাবিধ ভোগবিলাসের মধ্যে রাখিলেন।

কিন্তু বাল্যকালাবধিই বুদ্ধদেব কিছু ভাবুক ও চিন্তাশীল ছিলেন। এত সব ভোগবিলাস তাঁহার ভাল লাগিত না; অনেক সময় এই সব আমোদ প্রমোদ হইতে দূরে গিয়া তিনি নির্জ্জনে চিন্তা করিতেন।

কপিলবস্তুর নিকটে কলিদেশ নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। কলিদেশের রাজা দণ্ডপাণির গোপা নামে পরমা সুন্দরী বিদ্যাবতী বুদ্ধিমতী এবং নানাগুণে গুণবতী এক কন্যা ছিল। সিদ্ধার্থের যখন ১৯ বৎসর বয়স, তখন এই রাজকন্যা গোপার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইল।

বিবাহের পূর্ব্বে সিদ্ধার্থ অশোকাভাণ্ড বিতরণ করিবেন বলিয়া, শুদ্ধোধন অনেক রাজকন্যাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। অনেকে আসিয়া অশোকভাণ্ড লইয়া গেলেন।

গোপাও আসিলেন। কিন্তু তখন অশোকভাণ্ড সব ফুরাইয়া গিয়াছে। গোপা কহিলেন,—"কুমার, আমি নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছি। অশোকভাণ্ড কি পাইব না?"

সিদ্ধার্থ লজ্জিত হইয়া নিজের অঙ্গুলী হইতে বহুমূল্য অঙ্গুরীয়ক তাঁহাকে দান করিলেন। গোপার রূপ দেখিয়া, আলাপে তাঁহার বিদ্যা ও গুণের পরিচয় পাইয়া, সিদ্ধার্থ তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন। গোপাও মনে মনে সিদ্ধার্থকে আত্মসমর্পণ করিয়া পিতৃগৃহে ফিরিয়া গেলেন।

পুত্রের মনের ভাব জানিতে পারিয়া শুদ্ধোধন দণ্ডপাণির নিকট গোপার সঙ্গে সিদ্ধার্থের বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়োচিত শৌর্য্য বীর্য্য অপেক্ষা ভাবুকতা ও চিন্তাশীলতার জন্যই সিদ্ধার্থ লোকসমাজে অধিক পরিচিত ছিলেন। তাই দণ্ডপাণি বিবাহের প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন। সিদ্ধার্থ তখন নানাবিধ ব্যায়াম ক্রীড়া ও অস্ত্রচালনায় ক্ষত্রিয়োচিত দৈহিক

উৎকর্ষের এবং সামরিক শিক্ষার অনেক পরিচয় দিলেন। এইরূপে রাজপুত্র, ক্ষত্রিয়ের অবশ্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, গোপা-রত্ন লাভে ধন্য হইলেন।

(২)

মনোগত স্বামী লাভ করিয়া স্বামীর প্রণয়ে স্বামীর সঙ্গে দশ বৎসর কাল গোপার সুখে কাটিল। গোপা বুদ্ধিমতী এবং উন্নত চরিত্রের মহিমায় মহিমাময়ী। উৎকৃষ্ট বিদ্যা ও জ্ঞান লাভে তাঁ'র মন উদার ও উন্নত; সুতরাং তাঁহার ভাব, চিন্তা ও আচরণে একপ্রকার সজীব এবং মুক্ত তেজস্বিতা সর্ব্বদা প্রকাশ পাইত। সাধারণ স্ত্রীলোকের চালচলনে যে সব কঠোর বাধা ও নিয়ম আছে, সে সব তিনি কিছু মানিতেন না। তিনি কখনো ঘোমটা দিতেন না। স্বাধীন ভাবে রাজপুরীর মধ্যে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেন এবং সকলের সঙ্গে অবাধে আলাপ পরিচয় করিতেন।

এজন্য অন্যান্য পুরস্ত্রীরা গোপাকে বড় নিন্দা করিত। এইরূপ নিন্দা শুনিয়া গোপা একদিন সকলকে ডাকিয়া কহিলেন,—"ধর্ম্মই নারীর আবরণ, ধর্ম্মই তাঁহার সৌন্দর্য্য, ধর্ম্মই তাঁহার লজ্জা।—

আপনার ধর্ম্মবলে যে নারী আপনাকে রক্ষা করিতে পারে, মন যা'র আপনার বশে, ভোগলালসায় প্রাণ যা'র কখনো চঞ্চল হয় না, চরিত্রগুণে চিত্ত যা'র চিরপ্রসন্ন, যে অনর্থক বেসি কথা কহে না, তাহার অবরোধ বা অবগুণ্ঠনের কোন প্রয়োজন নাই।

সে যেখানেই যা'ক্‌ না, যা'র সঙ্গেই কথা বলুক না, ধর্ম্মতেজে তেজস্বিনী, নারীধর্ম্মের মর্য্যাদাবোধে স্বাভাবিক লজ্জায় লজ্জাশীলা এমন নারীকে কোন পাপ, কোন অমর্য্যাদা স্পর্শ করিতেও পারে না। নারীধর্ম্মের মহিমায় আপনাকে যে ধারণ করিতে পারে না, চিত্ত যা'র চঞ্চল, প্রাণে যা'র ভোগলালসা প্রবল, মন যা'র পাপচিন্তায় পূর্ণ, স্বামীর প্রতি যা'র ভক্তি শ্রদ্ধা নাই, আপনার দুর্ব্বলতায় সামান্য প্রলোভনে, সামান্য বিপদে, যে ভাঙ্গিয়া পড়ে, শত অবরোধে, শত অবগুণ্ঠনেও তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। আপনাকে যে রক্ষা করিতে পারে, কাননে, প্রান্তরে, জন-সমাগমে, সর্ব্বত্র সে আবরণ ব্যতীতও সুরক্ষিত। আর সেই শক্তি য'ার নাই, গৃহে শত আবরণের মধ্যেও সে অরক্ষিত। ধর্ম্মবলে আমি আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ,—হাসিতে, কথায়, আচরণে কোনরূপ চঞ্চলতা আমি কখনো দেখাই না; স্বামীর পায়ে আমার অচলা ভক্তি; ঘোমটার আমি কোন প্রয়োজন দেখি না। নিঃশঙ্ক চিত্তে সর্ব্বত্র যাইতে পারি, কেন তবে গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিব? আমাকে ধর্ম্মশালিনী পতিব্রতা ও লজ্জাশীলা জানিয়াও কেবল কতকগুলি অনর্থক বাহিরের নিয়ম পালন করি না বলিয়া কেন আপনারা আমার এইরূপ নিন্দা করেন? আপনাদিগকেও তো মনে কখনো অশ্রদ্ধা করি না, ব্যবহারে কখনো অসম্মান করি না।"

পুরস্ত্রীরা লজ্জিত হইলেন। আর কখনো গোপাকে তাঁহারা নিন্দা করিতেন না।

(৩)

এইরূপে দশ বৎসর কাটিয়া গেল। গোপার একটি পুত্রসন্তান হইল। ছয়দিনের শিশু লইয়া গোপা যখন সূতিকা-গৃহে নিদ্রিত, তখন সিদ্ধার্থ জগত-বাসী মানুষের দুঃখ দূর করিবার জন্য সন্ন্যাসী হইয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া গেলেন।

রাজপুরীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। স্বামী গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী,—কিন্তু গোপা, একে রমণী, তায় শিশুপুত্রের জননী; গৃহত্যাগ তাঁ'র পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি গৃহেই সন্ন্যাসিনী হইলেন।

রাজবধূবেশ ত্যাগ করিয়া গোপা সন্ন্যাসিনীর বেশ পরিলেন। রাজপুরীতে রাজবধূর ভোগবিলাস সমস্ত ছাড়িয়া, তিনি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিলেন।

শ্বশুর বুঝাইলেন, শাশুড়ী কাঁদিলেন, কিন্তু গোপার মন টলিল না। তিনি সন্ন্যাসিনীর দীনবেশ, সন্ন্যাসিনীর কঠোর ব্রত ত্যাগ করিলেন না।

শাশুড়ীকে বুঝাইয়া গোপা কহিলেন,—"মা, ধর্ম্মশীলা হইয়া কেন আমাকে অধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিতেছ? স্বামী যা'র সন্ন্যাসী, বসন ভূষণে, ভোগবিলাসে তা'র কি প্রয়োজন মা? স্বামীই নারীর সর্ব্বস্ব, স্বামীই সুখ, স্বামীই ভোগ, স্বামীই বিলাস, স্বামীর সুখের জন্যই বসন ভূষণ। স্বামী যখন গৃহ ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাঁ'র সঙ্গে আমার সবই গিয়াছে। গৃহধর্ম্মের সুখ গিয়াছে, ভোগবিলাস গিয়াছে, বসন ভূষণের প্রয়োজন গিয়াছে, গৃহধর্ম্মই আমার ফুরাইয়াছে।

স্বামী যখন রাজপুত্র ছিলেন, রাজবধূরূপে আমি তাঁ'র যোগ্য সঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিণী ছিলাম। আজ তিনি সন্ন্যাসী, আমাকেও সন্ন্যাসিনীই হইতে হইবে। স্ত্রীর যাহা জীবনের ব্রত, তাহাই পালন করিতেছি, ইহাতে কেন বাদী হও মা ? আর, তোমার পুত্র আজ সন্ন্যাসী হইয়া দীনবেশে বনে কঠোর তপস্যা করিতেছেন, ইহা যদি তোমার সয়, গৃহে থাকিয়া বধূর সন্ন্যাসিনী-বেশ, সন্ন্যাসিনীর ব্রত, ইহা কি সহিবে না ?"

গৌতমী দেবী নীরব হইলেন। ইনি সিদ্ধার্থের মাতৃস্বসা ও বিমাতা। সিদ্ধার্থের জননী মহামায়া পুত্রের জন্মের সাতদিন পরেই প্রাণত্যাগ করেন। গৌতমীই মাতার ন্যায় সিদ্ধার্থকে প্রতিপালন করিয়াছেন। গৌতমীর পুত্র বলিয়াই সিদ্ধার্থ গৌতমবুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ।

(৪)

ছয় বৎসর কঠোর সাধনার পর সিদ্ধার্থ সিদ্ধি লাভ করিয়া 'বুদ্ধ' হইলেন এবং ভিক্ষুবেশে সর্ব্বত্র নিজের ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে বুদ্ধদেব একবার কপিলবস্তুতে আসিলেন। বৃদ্ধ শুদ্ধোদন তখনো জীবিত। রাজপুরীতে বুদ্ধদেবের আগমন সংবাদ পৌঁছিল। আনন্দে অধীর হইয়া সকলে রাজপুত্রকে দেখিবার জন্য ছুটিল। দেখিল, রাজপুত্র ভিক্ষুবেশে রাজপথে ভিক্ষা করিতেছেন এবং নিজের ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিতেছেন।

গোপা ছাদে উঠিয়া ভিক্ষু স্বামীকে দেখিলেন।

হায়! গোপা কি, দেখিতে পারিতেছেন?—সহস্র মণিমাণিক্য যাঁহার বর-অঙ্গে উঠিতে পারিলে ধন্য হইত, শত শত শিল্পী যাঁহার বেশ রচনায় ক্লান্ত হইয়া পড়িত, অগণ্য ভৃত্যে যাঁহার বেশভূষণ-সম্ভার বহিয়া লইয়া যাইত,—নিজে গোপা মুগ্ধ হইয়া যে বেশ আপনার করে সুসংন্যস্ত করিয়া দিতেন,—আজ সেই স্বামী স্বেচ্ছায় ভস্মের মত সে সমুদয় রাজৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া দীন ভূষণহীন বেশে আপনারই রাজ্যের রাজপথে নগ্নপদে পরিভ্রমণ করিতেছেন! চাঁদঢাকা নিবিড় মেঘের মত তাঁহার কুঞ্চিত কেশভার—নিত্য সুবাসবিলসিত সেই কুন্তলরাজি কোথায়? কর্ণে হীরকোজ্জ্বল কুণ্ডল কোথায়?—সে রাজবেশ কোথায়? গোপা দেখিলেন। নয়ন গলিয়া অশ্রু ছুটিল। গোপা স্বামীর মুণ্ডিত শির ও দীন ভিখারীর বেশ দেখিয়া অশ্রু আর সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না।

কিছুকাল কাঁদিয়া, গোপা আত্মসংবরণ করিলেন। মনে মনে গোপা ভাবিলেন,—"ছি, আমি এ কি করিতেছি? কোন্ ছার দুঃখে কাঁদিতেছি। আমি কি দেখিতেছি না—তাঁহার প্রতি পাদক্ষেপে জ্যোৎস্নার আলোকে নগর হাসিয়া উঠিতেছে, নগরবাসীদের বদনে সেই অমৃতকিরণের প্রসাদরাশি প্রতিফলিত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে! আর, আমি তাঁহার ধর্ম্মপত্নি,আমি কাঁদিতেছি?—হায়! বেশভূষণ-হীন অথচ অতুল জ্যোতির্ম্ময় ঐ মূর্ত্তি, উহার কাছে কি রাজার রাজ-মূর্ত্তি? ঐ পরিপূরিত শান্তির জ্যোতির্ব্বিমণ্ডিত মহামূর্ত্তি স্বামী আমার,--স্বামী আজ আমার মানব-রূপে দেবতা; আজ তিনি ভোগ-

বাসনার অতীত, সুখ-দুঃখের অতীত, আজ রাজবেশে আর ভিক্ষুবেশে তাঁ'র নিকট কোনই পার্থক্য নাই। আজ রাজপুরীর রাজভোগ আর দীনভিখারীর কুটিরের শাকান্ন তো তাঁর নিকট সমান। আহা, আজ কে এত মহৎ, কে এত উচ্চ ? তাঁহার অমৃতধৌত উজ্জ্বল মূর্ত্তি আমি পার্থিব বেশভূষণে আচ্ছন্ন দেখিতে চাহিতেছি! আজ স্বামীর দেবত্ব গৌরবে কোথায় আপনাকে গৌরবিনী মনে করিব, না, হীন মোহান্ধ নারীর ন্যায় কাঁদিতেছি! এতটুকুও মহত্ত্ব যদি আমার প্রাণে না থাকে, বৃথা আমি ওই মহাপুরুষের স্ত্রী নাম গ্রহণ করিয়াছি!"

যুক্তকরে গোপা স্বামীর দিকে চাহিয়া ভক্তিভরে দেবরূপী স্বামীকে প্রণাম করিয়া নামিয়া আসিলেন।

(৫)

বুদ্ধদেব রাজপুরীতে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। স্বামীর সন্ন্যাস-ব্রত ভঙ্গের আশঙ্কায় গোপা সাক্ষাৎ করিলেন না। বালকপুত্র রাহুলকে ডাকিয়া অন্তরাল হইতে বুদ্ধদেবকে দেখাইয়া গোপা তাহাকে কহিলেন,—"বাবা, ওই তোমার পিতা, যাও, উঁহাকে প্রণাম করিয়া উঁহার নিকট পিতৃধন প্রার্থনা কর।"

হায় গোপা, রাহুলের পিতৃধন যে কঠোর সন্ন্যাস,—তাহা কি তুমি জানিতে না? স্বামীর সন্ন্যাসে সন্ন্যাসিনী তুমি, গৌরবিনী হইয়াছ। কিন্তু কোন্ প্রাণে বালক পুত্রকেও সেই কঠোর সন্ন্যাসে সমর্পণ করিলে?

রাহুল পিতার নিকট গেল। পিতৃধনপ্রার্থী বালকপুত্রকে, সন্ন্যাসী পিতা সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত করিলেন।

(৬)

আরও কয়েক বৎসর চলিয়া গেল। শুদ্ধোদনের মৃত্যুকালে বুদ্ধদেব আর একবার কপিলবস্তুতে আসিলেন। শুদ্ধোদনের মৃত্যু হইলে, গোপা ও অন্যান্য পুরস্ত্রীরা বুদ্ধদেবের নিকটে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের প্রার্থনা করিলেন। ইঁহাদিগকে দীক্ষিত করিয়া বুদ্ধদেব এক ভিক্ষুণী সম্প্রদায় গঠন করিলেন। গোপা ইঁহাদের নেত্রী হইলেন।

আজ গোপার জীবন সার্থক হইল। আজ স্বামীর ত্যাগে ত্যাগশীলা, স্বামীর গৌরবে গৌরবিনী, স্বামীর ধর্ম্মে কর্ম্মে সঙ্গিনী, স্বামীর পুণ্য তেজোমহিমায় মহিমাময়ী, বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাসাধক মহাপুরুষের সহধর্ম্মিণী গোপা, কেবল নামে নয়, কার্য্যতঃও স্বামীর পরম সহধর্ম্মিণী হইলেন।

বুদ্ধদেবের প্রচারিত মহৎ-ধর্ম্ম কালে সমস্ত পৃথিবীতে প্রসারিত হইয়া পড়িল। তাহার এক অংশ এই মহাহৃদয়া আর্য্যনারীরই পরম সাধনার অমৃতময় ফল।

এইরূপ সাধনার আলোক—আর্য্যরমণীর এইরূপ শক্তি—আবার ভারতকে পৃথিবী মধ্যে সত্যে, ধর্ম্মে, আনন্দামৃতে, জয়ী প্রদীপ্ত এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়া তুলুক।

——প্রথম——ভাগ——

সমাপ্ত।

ঠাকুরদাদার ঝুলি বা বাঙ্গালার গীতিকথা